লাঙলের ফালে ফালে ওঠে শিলামূর্তি—কেউ সম্পূর্ণ, কেউ খণ্ড। কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে অচল ধর্মচক্র আলোর দিকে চোখ মেলে তাকায় হাজার বছরের ওপর থেকে। ভরা বর্ষায় দীঘির উঁচু পাড়ি কেটে কেটে বৃষ্টির ধারা যখন নামে—তখন তার সঙ্গে হঠাৎ গড়িয়ে আসে এক টুকরো স্বর্ণমুদ্রা: "শ্রীশ্রীধর্মপালস্য"। পাঁচু মিঞার মুরগীর খোঁয়াড়ের তলায় একদিন কুড়িয়ে পাওয়া যায় একখণ্ড উৎকীর্ণ তাম্রপট্ট: "দেবাচল গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব সোমদত্তকে দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে এই ভূখণ্ড দান করলেন চণ্ডিকানুগৃহীত ক্ষত্রিয়কুলগৌরব ভূস্বামী বসুবন্ধু"।

শুধু তাই নয়। কাঠবাদাম আর পুরোণো নিম গাছের ছায়ার নিচে, স্বর্ণলতায় ছাওয়া লাটাবন আর মনসা কাঁটার আবেষ্টনে ভাঙা দরগা তাকিয়ে থাকে প্রেতপাণ্ডুর দৃষ্টিতে। পুরু শ্যাওলার আস্তর পড়া মস্‌জেদের গম্বুজের ফাটলে ফাটলে অশ্বত্থের শিকড় নামে নাগপাশের মতো। আলাদ-গোখুরের ফোকরভরা ভাঙাচুরো উঁচু জাঙ্গাল "শাহী শড়ক" নাম নিয়ে আকাশের দিকে মুখ ভ্যাংচায়।

সভ্যতার শ্মশান এই বরিন্দের মাঠ।

একদা গৌরবান্বিত ছিল জনপদে আর লোকালয়ে; বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে; শিল্পে আর বাণিজ্যে। সেদিনের সেই উজ্জ্বল প্রজ্ঞার নিদর্শনের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রুকনপুরের অতিকায় শিলাগঠিত দীপ-স্তম্ভ। একমণ ঘী আর একখান কাপড় দিয়ে আজ আর সেই দীপস্তম্ভে প্রদীপ জেলে দেয়না কেউ। কবে একদিন সে প্রদীপ বুক জ্বলে নিবে গেছে—আর সেই সঙ্গে গৌড়ের প্রাসাদেও ঘটেছে দীপনির্বাণ—বরেন্দ্রভূমির বুকে ছড়িয়ে গেছে বিস্মৃতির নিশিপট।

আর ডাকে বান। বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল নামে।

বরিন্দের ঢালু মাঠের ওপর। মহাসাগরের রূপ ধরে। দেশী গাড়োয়ানের গোরুর গাড়ির 'লিক' তলিয়ে থাকে তিরিশ হাতের জলের নিচে। এলো-মেলো বাতাসে বাদাম তোলে পশ্চিমা মাঝিদের নৌকো।

একদিন এই নদীগুলি ছিল বরিন্দের বাণিজ্যপথ—তার জীবনসরণি। কিন্তু শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন। পলিমাটি পড়ে গর্ভ যতই ভরাট হয়ে উঠছে—ততই বন্যার উচ্ছ্বসিত জলধারাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। অভিশপ্ত 'বরিন্দের মাঠ' যেন আত্মবিস্তার করতে না পেরে আত্মহত্যা করে চলেছে।

বাংলা দেশের প্রাচীনতম মৃত্তিকা। রাঢ় বঙ্গ যখন অবগুণ্ঠিত জলায় আর বাদাবনে—সেদিন সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত এই লাল মাটি—'বরেন্দ্রভূমি'। একদিকে যখন কষাড়-জঙ্গলের মাঝখানে জ্বলন্ত বাঘের চোখে আর হোগলার চড়ায় কুমীরের লেজ-ঝাপ্‌টানিতে প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রাম, তখন এই রাজপথ দিয়ে 'গৌড়াবনীবাসবের' চতুরঙ্গ গৌরবে রণযাত্রা।

জৈন-তীর্থঙ্করদের পদচ্ছায়ায় ভিক্ষু করুণাশ্রীর ধ্যান-বিলীন সৌম্যমূর্তি; সংঘস্থবির মণিভদ্রের উদার কণ্ঠে মুখরিত 'ত্রিপিটকের' পবিত্র বাণী; একলাখী আর সোনা মসজেদের উচ্চশীর্ষ থেকে 'আজানের' প্রভাতী ঘোষণা—একলক্ষ মানুষের সমবেত একটা সশ্রদ্ধ ছবি।

শুধু কি ক্ষয় আর মৃত্যুর ইতিহাস? না।

বরিন্দের রাঙা-মাটির মাঝখানে দিগ্‌বিকীর্ণ একটি দীঘি—"দীঘোর দীঘি" তার নাম; একটি বিচূর্ণ বিধ্বস্ত প্রাচীন প্রাকার: তার নাম "ভীমের জাঙ্গাল"।

নিঃশব্দ ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে অকস্মাৎ।

রাজা দ্বিতীয় মহীপাল। মহারাজচক্রবর্তী ধর্মপাল-দেবপালের বংশে

মূর্তিমান কুল-কলঙ্ক। মদ্যপ, লম্পট, অত্যাচারী। নারীমাংস-লোলুপতায় তার তুলনা নেই। একদিকে যেমন একজন সমৃদ্ধ প্রজা একটি মুহূর্ত শান্তিতে কাটাতে পারে না, অন্যদিকে একটি সুন্দরী নারী নিশ্চিন্ত ঘুমুতে পারে না একটি রাত্রিতেও।

তার পর একদিন আগুন জ্বলল। অহল্যা মাটির পাষাণ বুকের ভেতর থেকে বিদীর্ণ হল আগ্নেয়গিরি। বাংলার মাটিতে প্রথম সার্থক গণ-বিপ্লব—শূদ্র শক্তির উদ্বোধন।

ইতিহাসের পাতায় তার নাম 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ'। শুধু তাই বলে এই বিদ্রোহ একটা বিশেষ শ্রেণীগতই ছিলনা, তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিয়েছিল শ্রেণীবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষ; দিব্যোকের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ কৈবর্ত-শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজপ্রতাপ—নিজের রক্ত দিয়ে এতদিনের সঞ্চিত ঋণ শোধ করতে হল মহীপালকে। প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধি দিব্যোক স্ববলে আয়ত্ত করলেন গৌড়ের সিংহাসন, ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের ভীমভুজ রক্ষা করতে লাগল এই নতুন রাষ্ট্রকে।

দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সে কৈবর্ত-রাষ্ট্র। কিন্তু শত শত বছর পরে আগামী পৃথিবীর সূচনা এঁকে দিয়ে গেছে কাল-পুরুষের অক্ষয় পাণ্ডুলিপিতে। স্বাক্ষর রেখে গিয়ে গেছে গণ-মানবতার—ওই মজে-আসা "দীবোর দীঘিতে", তার শিলামণ্ডিত জয়স্তম্ভে, দিগ্‌বিস্তীর্ণ ভীমের জাঙ্গালে। ভবিষ্যতের মানুষের কাছে পূর্বগামীদের প্রেরণা।

সেই প্রেরণাই কি পেয়েছিল তারও কয়েকশো বছর পরে আদিনার সাঁওতালেরা? অনার্য শক্তি কি নতুন করে খুঁজেছিল আত্মপ্রকাশের পথ? জিতু-সাঁওতালের ভেতর দিয়ে আত্মঘোষণা করতে চেয়েছিল দিব্যোকের বিদ্রোহী প্রেতসত্তা?

STATE CENTRAL LIBRARY, WEST BENGAL
G/0785

না—লাল মাটি শুধু তো মৃত-কালের একটা স্তব্ধ সমুদ্রই নয়! বরিন্দের মাঠে মাঠে শুধুই তো আকীর্ণ নেই মৃত-সংস্কৃতির পঞ্জবাস্থি। নদীর বাঁধভাঙা বন্যায় বন্যায় শুধুই তো সূচিত হয় না নতুন কোনো আত্মহত্যার ইতিহাস।

লাল মাটি। রক্তচন্দনের তিলকপরা জটামণ্ডিত কাপালিক। 'ডাঁড়ার' জলধারায় উচ্চকিত তার খর-খড়্গের দীপ্তি। একটা নতুন সত্যের—নতুন পৃথিবীর সাধনাই সে করে চলেছে। মৃত-কালের শবদেহে তার তন্ত্রাসন—নিশি রাত্রের আলেয়ায় আলেয়ায় তার চোখ সংস্কৃতির এই বিপুল শ্মশানে অস্থি-অক্ষ সন্ধান করে ফেরে।

আর অন্ধকারে চোখ মেলে রাখে রুকনপুরের দীপস্তম্ভ। তাকিয়ে থাকে দীবোর দীঘির জয়স্তম্ভের দিকে। প্রদীপ আর পতাকা। তারা কতদূরে যারা নতুন করে আবার দীপ জ্বেলে দেবে, কোথায় ঘুমিয়ে আছে তারা—যারা নতুন ধ্বজার ঔদ্ধত্যে স্পর্ধা করবে আকাশকে?

ঝোড়ো হাওয়ায় পুরোনো অশ্বত্থ-বটের ডালে-পালায় রুদ্র-তান্ত্রিকের জটা দুলে ওঠে। মেঘের ডাকে শোনা যায় তার গুরু গুরু স্বর: তারা আসছে!

উগ্র ভয়ঙ্কর আলোয় চারদিক জ্বালিয়ে দিয়ে তাল গাছের মাথায় বজ্র পড়ে। চড়্‌চড়্‌ করে ফেটে যায় খানিকটা মাটি—তীব্র পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে। আর বাঁকা খড়্গের মতো 'ডাঁড়া'র জলটা ঝিকিয়ে ওঠে আর একবার, লাল মাটির একটা ঝড় হু হু করে ছুটে যায় দীর্ঘশ্বাসের মতো।

* *

S/
চ৯৯.৪৪৩
আ/লা
VIP Road, Kolkata

এক

—শন্-শন্-শন্—

একটার পর একটা তীর চলেছে। ঘাসের বন ভেঙে-চুরে জানোয়ারটা যতই পালাতে চেষ্টা করুক, আজ আর রক্ষা নেই ওর। সাঁওতালেরা নির্ভুল ব্যূহ-রচনা করেছে চারদিকে। যেন শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ছে ওরা—প্রত্যেকটি তীর গিয়ে লাগছে লক্ষ্যস্থলে।

বুনো শূয়োরটা দেখল আর আত্মগোপনের চেষ্টা করা বৃথা। এদিকের ঘাস-বন তোলপাড় করে সে লাফিয়ে পড়ল বাইরের ফাঁকা মাঠের ভেতরে। ততক্ষণে তার নোংরা বিশাল শরীরটায় গোটা তিনেক তীর কাঁপছে থর্ থর্ করে—ঘন রক্ত সারা গায়ে তার জমে আছে রক্তজবার একটা মালার মতো।

নিতান্তই দুর্বুদ্ধি, তাই এই তল্লাটে একটা বুনো ওলের গোড়া খুঁড়তে এসেছিল সে। তাতেও যথেষ্ট হয়নি—একটা রাখাল ছেলেকে একটু দূরেই দেখতে পেয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাড়া করেছিল তাকে। গায়ে বেশি চর্বি থাকার জন্যেই হোক কিংবা রোদের তাপটা একটু বেশি প্রবলই হোক, তার মাথাটা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছিল তখন। ছোকরাকে আয়ত্তের মধ্যে পেলে দুটো ধারালো দাঁতে তার পেটটাকে তৎক্ষণাৎ একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত সে।

কিন্তু কাছাকাছি একটা বাব্‌লা গাছ ছিল, তাই রক্ষা। ছোকরা একলাফে তাইতেই উঠে বসল। শুধু উঠে বসল তাই নয়—প্রাণপণে চিৎকার শুরু করলে সেখান থেকে।

দূরে কাঁদড়ের পাশ দিয়ে মহুয়া বনে হরিয়ালের খোঁজে চলেছিল

জোয়ান মাঝি একদল। চিৎকারটা কানে গেল তাদের। হৈ হৈ করে দৌড়ে এল তারা।

ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝেছে বুনো শূয়োর। উর্ধ্বশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘাসবনের এই ফালিটুকুর মধ্যে। তার পর থেকেই চলেছে এই চক্রব্যূহের আক্রমণ।

নিরুপায় হয়ে মাঠের মধ্যেই সে লাফিয়ে পড়ল তারপর। জবার মালার মতো থকথকে রক্ত তার সারা গায়ে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আওয়াজটা যন্ত্রণার গোঙানিতে পর্যবসিত হয়েছে এতক্ষণে।

শাঁ করে আর একটা তীর এসে বিঁধল তার চোখের ওপর। অন্ধের মতো শেষ-আক্রোশে সম্মুখের লোকটার ওপর সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে গেল। ছিঁড়ে টুকরো করে দেবে তাকে—নেবে মর্মান্তিক প্রতিহিংসা। কিন্তু সে চেষ্টা করবার আগেই চক্ষের পলকে আর একটা তীক্ষ্ণ ফলক এসে তার ফুসফুসটাকে ভেদ করে দিলে—হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে—থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল সারা শরীর।

তীর ছুটে এল শন্ শন্ করে—একটার পর একটা। কখন যে নিজের সঙ্কুচিত দেহটাকে প্রসারিত করে দিয়ে চিরদিনের মতো স্থির হয়ে গেল নিজেই জানে না সে। সমস্বরে জয়ধ্বনি তুলল সাঁওতালেরা।

আর ঠিক সেই সময়ে, মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে সকৌতূহলে সেখানে সাইকেলটা থামালো রঞ্জন—কর্মী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আগ্রহ-ভরে জানতে চাইল: কিরে, কী শিকার পেলি তোরা?

—বরা, বাবু—একমুখ হেসে জবাব দিল একজন।

—বেশ বড় তো।—রঞ্জন ভীতি-মেশানো চোখে তাকিয়ে রইল শূয়োরটার দিকে।

—হাঁ বাবু, খুব বড়।—আর একজন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে:

দাঁতাল্। আমরা সময়মতো এসে না পড়লেই শালা উ ছোকরাকে মেরে ফেলত একদম।

রাখাল ছোকরা তখন কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের দিকে একটা শাদা কাপড়ের ফালি ঝুলছে, তা ছাড়া আর কোনো পরিধেয়ই নেই তার। দুকানে দুটো তামার বীরবৌলি—তার একেবারে আদিম বেশ-বাসের সঙ্গে ওদুটোকে কেমন বেখাপ্পা বলে মনে হয়। হাতে তার একটা পাচনবাড়ি—উত্তেজিতভাবে তখনো ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল সে।

ওদের কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এল। অত্যন্ত বীরের মতো সজোরে গোটা দুই লাথি মারল শূয়োরটার পেটের ওপর। ধূলিমলিন কালো পায়ে জড়িয়ে গেল একরাশ জমে-আসা ঘন রক্ত।

বললে, আমাকে মারবি? মার্ শালা, মার্ ইবারে।

রঞ্জন হাসল: খুব জোয়ান দেখছি যে। এই, কী নাম তোর?

পায়ে শূয়োরের রক্ত মেখে ছেলেটা তখনো বীররসে উদ্দীপ্ত। সগর্বে বললে, ধীরুয়া।

একজন জানিয়ে দিল।

—উ টুল্কু মাঝির ব্যাটা। উর বাপের কথা জানো না! সেই যে মাঝিটা—ফতে শা পাঠানের পাইককে খুন করে হাজতে গেল?

মনে পড়ল ঘটনাটা। মাত্র বছর দুয়েক আগে। এ অঞ্চলের নাম-করা জমিদার ফতে শা পাঠান। দুর্জনে বলে, সোনা দীঘির হাটের পথে নিজের লোক লাগিয়ে বাপকে খুন করায় সে, তারপর হাত করে জমিদারী। পিতৃহত্যার রক্ত হাতে মেখে নিঃসংকোচে সে তার রাজ্যপাট চালিয়ে যাচ্ছে।

এমন লোকের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক যে খুব মধুর থাকবে না, সে বলাই বাহুল্য। কিন্তু সাঁওতালেরা মোটের ওপর জমিদারের সান্নিধ্য

থেকে দূরেই ছিল অনেককাল। কুঁজিকাঁটা আর ইকড় ঘাসে ভরা পতিত জমিতে বাস্তু বেঁধে বাস করতে অভ্যস্ত এই যাযাবরের দল। সামান্য ক্ষেত খামার আর শিকার করেই এদের দিন কাটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জমিদার এদের কাছে প্রত্যাশা রাখে না—এরা খুশি মতো একসের তামাক কিংবা দুটো একটা তিতির নজর দিয়ে আসে কখনো সখনো।

কিন্তু ফতে শা পাঠানের জমিদারী মেজাজ হঠাৎ দিল্লীর শাহেন্‌শা বাদ্‌শাহের মতো চড়ে উঠল। গোরুর গাড়ি করে আসতে আসতে সে দেখল, মাঠের একটা অংশে মটর-কলাই একটি ঘন-সবুজের ছবি এঁকে রেখেছে।

ফতে শা জনতে চাইল: ও জমি কার?

বিশ্বস্ত 'বাদিয়া' বরকন্দাজ বললে, হুজুরেরই!

—আহাম্মক!—ফতে শা খানিক থুথু ছিটিয়ে বললে, জমি যে আমার, সে আমি জানি। কিন্তু রায়ত কে?

—আজ্ঞে সাঁওতাল।

—সাঁওতাল?—একবার চোখ তুলে তাকালো ফতে শা: খাজনা দেয় কত?

—কিছুই না—।

—কিছুই না? কেন?—চোখ লাল করে জানতে চাইল ফতে শা: আমার প্রজা, অথচ খাজনা দেয় না?

—জী, ওটা পতিত জমি।

—পতিত জমি?—ফতে শা গর্জন করল। কিন্তু খয়রাতী তো নয়। জমি আমার। পতিত হোক যাই হোক—চাষ দিতে কে বলেছিল ওদের? খাজনা চাই।

—সাঁওতালেরা ক্ষেপে যাবে হুজুর—

—ডরপোক কুত্তার দল—চেঁচিয়ে উঠল ফতে শা : নেমকহারামের বাচ্চা! সাঁওতালের ভয়ে ল্যাজ্ গুটিয়ে আছিস! খাজনা চাই আমার —কালই যেন পাইক আসে।

পাইক এল পরের দিন।

ভদ্র ভাষায় কথাবার্তা বললে হয়তো রফা একটা হতে পারত, কিন্তু ফতে শা পাঠানের পাইক-বরকন্দাজদের শিক্ষাদীক্ষা অন্য রকম। তা ছাড়া খুনখারাপী করা বাদিয়া, কাউকে বরদাস্ত করবার বান্দাই নয়। ফলে শেষ পর্যন্ত একটা তীর এসে মহবুব পাইকের গলা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিলে। পুলিশ এসে চালান দিলে টুল্‌কুকে—দশ বছর হাজত হয়ে গেল তার।

সেই টুল্‌কুর ব্যাটা এই ধীরুয়া! রঞ্জন একবার অন্যমনস্কভাবে তাকালো ধীরুয়ার দিকে। কেউটের বাচ্চা কেউটে? বিষ সঞ্চয় করে প্রস্তুত হচ্ছে দিনের পর দিন—বরিন্দের প্রান্তে প্রান্তে, লাল মাটির টিলার আড়ালে আবডালে!

চমক ভেঙে গেল।

সাঁওতালদের একজন বললে, বাবু, আজ রাতে আমাদের পাড়ায় তুর নিমন্তন্ন।

—ওই শূয়োর খাওয়াবি বুঝি?

—হাঁ, আর পচাই।

—দুটোর একটাও আমার চলবে না মোড়ল—রঞ্জন হাসল: নিমন্তন্নটা জমা রইল ভবিষ্যতের জন্যে। কেমন?

—হাঁ বাবু।

—আচ্ছা—মৃদু হাসল রঞ্জন, শেষবার তাকালো টুল্‌কুর ছেলে ধীরুয়ার দিকে। তারপর আবার সাইকেল হাঁকিয়ে ধরল জয়গড় মহলের পথ—হাতে তার অনেক কাজ এখন।

দুই

ধানসিঁড়ির দেশ এই বরিন্দ্।

দূর থেকে মনে হয় যেন অতি বিশাল একটা বৌদ্ধ প্যাগোডা। ঢেউ-তোলা মাটি চলেছে দিক থেকে দিগন্তে—যতদূর চোখ চলে উঁচু নীচুর খেলা। ঢেউ-তোলা এই মাঠের বুকে লক্ষ্মীর আঁচল-ঝাড়া ধানের সমারোহ, আলের রেখাগুলো দিয়ে বাঁধা ধানক্ষেতগুলি এক একটা সিঁড়ির মতো নেমে এসেছে। ফসল যখন বাড়-বাড়ন্ত হয়ে ওঠে—শরতের রোদ্দুরে মেখে হিরণ্যশীর্ষগুলি নুয়ে নুয়ে পড়ে আলের ওপর, তখন মনে হয় বরিন্দের মাঠ জুড়ে কে যেন একটার পর একটা সোনার স্তূপ সাজিয়ে গেছে। আকাশ থেকে এক এক ছড়া পান্নার মালা কে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ওপর—উড়ে পড়ছে গাঢ়-সবুজ নল-টিয়ার ঝাঁক।

এই ধানসিঁড়ির ভেতর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে নেমেছে একটা ফালি পথ। মানুষের পায়ে পায়ে মসৃণ—সূর্যের আলোয় প্রোজ্জ্বল। কোথাও কোথাও পুরু লাল ধূলোর স্তর পড়ে আছে, তার ওপর সরু সরু সর্পিল রেখা জড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে। ওর অর্থ বুঝতে গেলে আসতে হবে সন্ধ্যার পরে—যখন তালবনের মাথার ওপর চাঁদটা ভালো করে উঠে আসবে—যখন অল্প অল্প 'লিলুয়া' বাতাসে ভেসে বেড়াবে বহু দূরে ফোটা ঝাঁটি-আকন্দের গন্ধ; সেই সময় জুড়িয়ে যাবে দিনের দাবদাহ—মাটির ফোকরের ভেতর থেকে একটি একটি করে মুখ বার করবে গোখরো আর কেউটের শিশুরা, বায়ু সেবন করবে, খেলে বেড়াবে খোলা পথটুকুর ওপরে। আর যদি মাটিতে টের পায় কোনো দূরাগত পদশব্দের স্পন্দন, তাহলে তৎক্ষণাৎ আত্মগোপন করবে ধানক্ষেতের আড়ালে।

সাইকেলের ব্রেকটা চেপে ধরে এই ঢালু পথ দিয়ে নামছিল রঞ্জন।

লক্ষ্মীর আঁচল-ঝাড়া ক্ষেত দুধারে বিস্তীর্ণ কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ধান এবারে হৃতশ্রী। অসময়ে কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়ে পোকা লেগেছে ধানে। শুক্তির বুকে আঁকড়ে রাখা মুক্তোর মতো ধানের স্নেহকোষে সঞ্চিত শস্যকণাটি কেটে খেয়েছে কীটেরা—এলোমেলো বাতাসে রেণুরেণু তুঁষ উড়ে যাচ্ছে। ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠল রঞ্জন। গত বছর বন্যায় ফসল গেছে, এবারে যদি পোকায় সর্বনাশ করে তাহলে মানুষের দুর্গতির কিছু বাকী থাকবে না আর। গেল বার আগাগোড়াই আধিয়ারদের কর্জের ওপর চালাতে হয়েছে; এবারে যদি শোধ না করতে পারে তা হলে না খেয়ে মরতে হবে দেশশুদ্ধ লোককে।

ধানের ক্ষেতে সবটাই সোনা নেই—তাতে কলঙ্কের দাগ পড়েছে। অথবা কোনো দিনই সোনা ছিল না—ওর ভেতরে সবখানিই খাদ, সবটুকুই কলঙ্ক। দূর থেকে দেখেছে বলেই বুঝতে পারেনি। মনে হয়েছিল, রৌদ্রপীত স্বর্ণাঞ্চল বুকে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন বঙ্গলক্ষ্মী। অনেক কবিতা লেখা হয়েছে তা নিয়ে—অনেক উচ্ছ্বাসে মুখর হয়েছে শহরের বক্তৃতামঞ্চ। কিন্তু ক্রমাগত বর্ষা আর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় ফিকে হতে শুরু করেছে গিলটির রং।

কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেমন সন্দেহ হয় একটা আকাল নামছে। আকাশের ওই দিকটাতে মেঘ জমে উঠছে—হয়তো ফাঁকা, হয়তো শেষ রাতের দিকে খানিক বৃষ্টি হতেও পারে। কিন্তু মনে হয় ওটা যেন একটা বিশাল গিন্নী শকুন;—সামনের দিকে মেঘের যে অংশটুকুর ওপর রোদ জ্বলছে তা ওরই শানানো ঠোঁট। শবদেহের মতো পৃথিবী পড়ে আছে দিকে দিকে—শুকনো কুঞ্চিত চামড়ায় বলিচিহ্নের মতো সাপের রেখা।

এখনই তো তার কাজ। জমি তৈরী হচ্ছে—সময় আসছে এগিয়ে। খাটুনিও বড় বেশি পড়েছে কিছুদিন যাবৎ। কুমার ভৈরবনারায়ণের ওখান

থেকে বাস এবার তুলতে হল। গীতাপাঠের অভিনয়টা আর চলছে না। কুমার বাহাদুরও এর মধ্যে সন্দেহ করেছেন বলে মনে হয়।

সেদিন সবে যখন কুমার বাহাদুরের আফিঙের মৌজটা বেশ জমে উঠেছে, ডেক চেয়ারটায় লম্বা হয়ে গড়গড়ার নল নিয়ে তিনি চোখ বুজেছেন; আর বালাখানা তামাকের আমেজে ভারী হয়ে গেছে ঘর, তখন রঞ্জন খুব দরদ দিয়ে তাঁকে গীতা বোঝাচ্ছিল।

কুমার বাহাদুরের ডায়বেটিজ আছে। শরীরের কোথাও ইল্‌সে গুঁড়ির ফোঁটার মতো একটা ফুস্কুড়ি দেখলে আতঙ্কে লাফিয়ে ওঠেন তিনি, চেঁচিয়ে ওঠেন: ডাক্তারকে বোলাও। আনো ইন্‌সুলিন। মৃত্যুভয় তাঁর নিত্য সঙ্গী। সেই জন্য রঞ্জন তাঁকে কিছুটা আশ্বাস দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিল।

গলার স্বরে যথাসাধ্য আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করেই সে পড়ে যাচ্ছিল:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি—
শরীরাণি তথা বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।...

অর্থাৎ কিনা, হে কৌন্তেয়, জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মানুষ যেমন নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে থাকে, তেমনি জীর্ণ শরীরকেও ত্যাগ করে মানুষ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্লোকটা কুমার ভৈরবনারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ মৃত্যুর দুর্ভাবনা এতে অনেকটা যেন লাঘব হয়ে আসে। আত্মা অজরামর—এই সত্যটা অধিগত হলে সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও আসে যে মরেই তিনি পত্রপাঠ ফুরিয়ে যাবেন না; তাঁর জমিদারীর স্বত্ব স্বামীত্ব ভোগ করবার জন্য আবার দেহধারণ করে ফিরে আসবেন মর্ত্যে।

কিন্তু ডায়েবেটিজ্‌ ভীত কৌন্তেয়—অর্থাৎ কুমারবাহাদুর আজ এমন

মনোরম আলোচনাতেও গদ গদ হয়ে পড়লেন না। ফরশীতে একটা টান দিয়ে কেমন মিটি মিটি চোখে তাকালেন।

বললেন, আচ্ছা ঠাকুরবাবু!

একদিকে বাবু, অন্যদিকে ঠাকুরমশাই—এই দুই মিলিয়ে হিজলবনীর রাজবাড়িতে এই বিচিত্র নামকরণ হয়েছে রঞ্জনের—ঠাকুর বাবু! কুমারবাহাদুর যেদিন রাত্রে একটু বেশি কারণ করেন সেদিন কখনো কখনো ঠাকুর বাবাও বলে থাকেন। রঞ্জনও পিতৃস্নেহে তাঁকে মোহ-মুদ্গর শোনাতে আরম্ভ করে। আজ কিন্তু আফিঙের এমন জমাট নেশার ঠাকুরবাবু সম্ভাষণের মধ্যেও কেমন একটা দূরত্ব ঘনিয়ে রইল।

—বলুন।

ভৈরবনারায়ণ গড়গড়ায় মৃদুমন্দ চুম্বন করলেন। তারপর:

—কাল বুঝি জয়গড় মহলে গিয়েছিলেন আপনি?

রঞ্জন নড়ে উঠল। সতর্ক হয়ে তাকালো ভৈরবনারায়ণের দিকে।

কিন্তু তাঁর চোখ তো ততক্ষণে আবার নেশার আবেগে অর্ধনিমীলিত হয়ে এসেছে। মুখে একটা নির্মল নির্লিপ্ততা—গীতাপাঠের নগদ নগদ ফল কিনা কে জানে। শিথিল ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলেন: বেরিয়ে এলেন বুঝি জয়গড় থেকে?

রঞ্জন অত্যন্ত সাবধানে উত্তর দিলে। আত্মপ্রকাশ করলে সংক্ষিপ্ততম শব্দে: হুঁ।—আরো কিছু বলবার আগে কুমারবাহাদুরের মনোগত অভিপ্রায়টা জেনে নিতে চায় সে।

কুমারবাহাদুর কিন্তু বেশি কিছু ভাঙলেন না। তেমনি নির্মল নির্লিপ্ত-ভাবে বললেন, তাই শুনলাম। তা জয়গড় বেশ ভালো জায়গাই বটে। যেমন ওর মহুয়া বনটি, তেমনি ওর নদীর ধার। খাসা জায়গা!

—ও।

কুমারবাহাদুর যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছেন, এইভাবে বললেন, নিন, শুরু করুন তা হলে আবার।—হ্যাঁ—কী যেন পড়ছিলেন? বাসাংসি জীর্ণানি—মানে পুরোনো বাসা ত্যাগ করে—

—বাসা নয়, বাস। মানে শরীর।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—শরীর।—গড়গড়ার নলটি আবার চুম্বন করেই ছেড়ে দিলেন কুমারবাহাদুর: তবে জয়গড়ে কয়েকটা বেয়াড়া লোক আছে—একবার দেখতে হচ্ছে তাদের। আর সেই কী বলে নগেন ডাক্তারকেও। সে যাক, আপনি পড়ুন। মানে পুরোনো শরীর ত্যাগ করে—

যন্ত্রের মতো পড়েছে অগত্যা, যন্ত্রের মতোই ব্যাখ্যা করে গেছে। শুনতে শুনতে ফরশীর নল মুখে করেই ঘুমিয়ে গেছেন ভৈরবনারায়ণ। কিন্তু মনের মধ্যে স্বস্তি পায়নি রঞ্জন। কুমারবাহাদুরকে সে যতটা চালাক ভেবেছিল, তিনি তার চাইতে আরো কিছু বেশি। যা বলবার মাত্র একটি কথাতেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন; স্পষ্ট করার চাইতে তিনি ইঙ্গিতেরই পক্ষপাতী বেশি।

অতএব বেশিদিন থাকা চলবে না আর। এখন থেকে হুঁসিয়ার না হলে নিজেই জালে পড়ে যাবে। তবু দেখা যাক—!

চিন্তাটা থমকে গেল হঠাৎ। বেশ রূঢ়ভাবেই। ভাবতে ভাবতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে—ধানসিঁড়ির ভেতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথটা সম্পর্কে যে আরো একটু সচেতন থাকা উচিত সে তার মনে ছিল না। অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সাইকেলটা একটা মাটির চাঙাড়ে টক্কর খেলো, তারপর সোজা ওকে নিয়ে পাশের ধানক্ষেতে কাত হয়ে পড়ল।

ধানসিঁড়ি সাজানো সোনার 'পালার' মতো বরিন্দের মাঠ শব্দ-সুরভিত হয়ে উঠল। আধখানা ভরা কলসীর জলের মতো আওয়াজ তুলে হেসে

উঠল একটি মেয়ে। ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে আর্ত কর্কশধ্বনি তুলে গোটাকয়েক নল্‌টিয়া ডানা মেলল আকাশে।

হাসছিল কালোশশী।

প্রথম বর্ষায় প্রাণ পেয়ে ওঠা নতুন লতার মতো চেহারা। উজ্জ্বল—পল্লবিত। বরিন্দের রোদ-বাতাস আর বৃষ্টিতে সঞ্জীবিত, রসায়িত মেয়েটি।

রঞ্জন সাইকেল টেনে লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়াতে কালোশশী এগিয়ে এল।

—হাসলি যে!

কালোশশীর মুখ আবার আলো হয়ে উঠল হাসিতে: অমন করে পড়ে যাবি তুই—হাসব না?

—আচ্ছা, আচ্ছা—মনে থাকবে।—রঞ্জন গম্ভীর হয়ে উঠল: যাবি তো রাজবাড়িতে—দেখা যাবে তখন। বলে দেব কুমারবাহাদুরকে—টের পাবি।

হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কালোশশী। কুমারবাহাদুরের নাম শুনেই যেন তার মুখের আলোটা ফিকে হয়ে এল। উজ্জ্বল দৃষ্টির ওপর নামল আশঙ্কার স্তিমিত ছায়াভাষ।

—আর আমি হাসবনা বাবু। সত্যি বলছি।

ব্যথিত বোধ করল রঞ্জন। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা শিশুকে একটা ভুতুড়ে মুখোস পরে ভয় দেখানোর অপরাধবোধটা স্পর্শ করল মনকে। সঙ্গে সঙ্গে কুমার ভৈরবনারায়ণের মুখখানা স্মৃতির ওপরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একবার। সাধারণ মানুষের মুখের চাইতে প্রায় দেড়গুণ বড়—টকটকে রাঙা তার রঙ; পুরু একজোড়া ঠোঁটের ভেতর থেকে দাঁতগুলো এমন ভঙ্গিতে বেরিয়ে থাকে যে অকারণ পুলকে সে মুখে এক আঁটি বিচালি

গুঁজে দিতে ইচ্ছে করে। হাসির বালাই সেখানে নেই—শুধু খামোকা মনে হয় লোকটা বুঝি মাথার ওপর থেকে এক জোড়া শিং বের করে এখুনি গুঁতিয়ে দেবে কাউকে। কালোশশীর দোষ নেই।

সদয় কণ্ঠে রঞ্জন বললে, আচ্ছা—এ যাত্রা মাপ করা গেল। কিন্তু কী নিয়ে যাচ্ছিস তুই? ঝাঁপিতে কী ও?

—একটা মজার জিনিস আছে—দেখবি? কালোশশীর মুখে আবার প্রাণের ছায়া পড়ল।

—মজার জিনিস? দেখি—

কিন্তু 'দেখি'—বলে দু-পা এগিয়ে গিয়েই 'বাপ্‌রে' বলে দশ পা পেছনে লাফিয়ে পড়ল সে। ঝাঁপির ঢাকা খুলতেই ভেতর থেকে তীব্র গর্জন উঠল একটা। পরক্ষণেই চাপ-সরে-যাওয়া স্প্রীঙের মতো অসহ্য ক্রোধে ফণা দোলাতে লাগল নীলকৃষ্ণ রঙের বিশাল একটি গোখ্‌রো সাপ। —তার ফণার ওপরে চক্রচিহ্নটা রোদে ঝলমল করে উঠল।

—কী সর্বনাশ! সাপ!

কালোশশী ততক্ষণে ক্ষিপ্র হাতে ঝাঁপি বন্ধ করে দিয়েছে। বললে, এখুনি ধরলাম কিনা—তাই এত তেজ। কামিয়ে দিতে পারলে আর অত মেজাজ থাকবে না।

—সেকি! এখনো ওর বিষদাঁত আছে তা হলে!—সভয়ে রঞ্জন বললে, যদি কামড়াতো?

—কামড়াবে কেমন করে?—সগর্বে কালোশশী বললে, বেদের কাছে কি সাপের চালাকি চলে বাবু? ওর মতন গণ্ডা গণ্ডা সাপ নিয়ে আমার কারবার।—কালোশশী মৃদু হাসল: চারটে পয়সা দিবি বাবু? তা হলে এখনি ওকে নিয়ে খেলা দেখাতে পারি।

—দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে।—তেমনি আতঙ্কে রঞ্জন বললে,

তোকে চার পয়সা দিতে যাব কেন? আমাকে কেউ চারশো টাকা দিলেও আমি ওর খেলা দেখতে রাজী নই!

কালোশশী তেমনি হাসতে লাগল: কিন্তু মরা সাপ নিয়ে খেলা করে কি সুখ আছে বাবু? এম্‌নি তাজা সাপ নিয়ে খেলতেই তো আরাম। হাতের তালে তালে নাচবে—ছোবল মারতে চাইলেও পারবে না, তারপর মাটি ঠুকরে ঠুকরে নিজেই কাহিল হয়ে পড়বে!

হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে কালোশশী তাকালো রঞ্জনের দিকে। ছিলে-টেনেধরা ধনুকের মতো তার ভ্রূ রেখা চকিতে প্রসারিত হয়ে গেল. নিস্তরঙ্গ দীঘির কালো জলে হঠাৎ একটা পাতা উড়ে পড়ার মতো আলো-ভাঙা হাল্‌কা ঢেউ খেলে গেল দৃষ্টিতে। আর তখনি কালোশশীর জীবনের যতটুকু ওর জানা, তা মনে পড়ে গেল।

আলোচনাটা তখনি থামিয়ে দিল রঞ্জন। সাইকেলে ওঠবার উপক্রম করে বললে, নে পথ ছাড়, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু আমি কাল একবার তোর কাছে যাব বাবু।

—আমার কাছে? কেন?

—ভারী বিপদে পড়ে গেছি বাবু—কালোশশী বিশীর্ণ হয়ে গেল: পরশুরাম ফিরে এসেছে।

—পরশুরাম? তোর আগের স্বামী?

কালোশশী লজ্জিতভাবে মাথা নামাল: হাঁ। আর বলছে, আমাকে খুন করবে।

—খুন করলেই চলবে! আইন আছে না? তুই ভাবিস্‌নি—রঞ্জন আশ্বাস দিতে চেষ্টা করল তাকে: আচ্ছা, আসিস তা হলে কাল।

পথ ছেড়ে দিয়ে ধানক্ষেতে নেমে দাঁড়িয়েছে কালোশশী, রঞ্জন সাইকেলে প্যাডল্ করল। উজ্জ্বল মেঠো পথ দিয়ে সাইকেলটা আবার

এগিয়ে চলল সবেগে। পেছনে তাকিয়ে দেখল রৌদ্রভরা মাঠের ভেতরে তরুণী সাপুড়ে মেয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে—তার গলার রূপোর হাঁশুলীতে একখানা বাঁকা তলোয়ারের মতো রোদ ঝলকাচ্ছে।

অদ্ভুত এই মেয়েটা! এ দেশী নয়—বাড়ি ওর বাংলা-বিহারের কোনো সীমান্তে। অথবা আসলে ওর কোনো দেশই আছে কিনা সন্দেহ। একটা বেদের দলের সঙ্গে ঘুরত, সেখান থেকে একজনের সঙ্গে পালিয়ে আসে লোকালয়ের স্থিতিতে। কিন্তু স্রোতের মন বাধা মানবে কার কাছে? তাই একটির পর একটি মানুষের সঞ্চার হচ্ছে ওর জীবনে। কিন্তু ওর সঙ্গে সমানগতিতে পা ফেলে তারা কেউই চলতে পারছে না—একটা বিশাল দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যেন একের পর এক পিছিয়ে পড়ছে তারা। বনহংসীর নীড় গড়বে কে?

দয়াল দাস, পরশুরাম, লক্ষ্মণ সর্দার। আরো কত আসবে কত যাবে, কে জানে। এ হাঁসের পাখায় ক্লান্তি নেই—এক দিগন্ত ছাড়িয়ে আর এক চক্রবাল তাকে ডাক দেয়; এক অরণ্য থেকে আর এক অরণ্য—এক সীমান্ত থেকে আর এক সীমান্ত।

এত কথা রঞ্জনও কি জানত? একটা চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করে পরশুরামকে ধরে আনা হয়েছিল কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছারীতে—সেই সঙ্গে বিলাপ করতে করতে এসেছিল কালোশশী। বুনো লতার পল্লবিত আরণ্য-সৌন্দর্য চমক লাগিয়েছিল তার চোখে—ভারী বিচিত্র মনে হয়েছিল।

কালোশশী তার মনের ওপর নেপথ্য প্রভাব বুলিয়েছিল কিনা আজ সে কথা বলতে পারে না। কিন্তু এটা ঠিক যে অনেকটা তারই চেষ্টায় সে যাত্রা অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যায় পরশুরাম। মাত্র দরোয়ানের কড়া হাতে গোটাকয়েক থাপ্পড় খেয়েই নিষ্কৃতি পায়—হাজত পর্যন্ত

G10785

যেতে হয়নি আর। সেই থেকেই তার ওপর কৃতজ্ঞ কালোশশী। পরশুরামের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবশ্য চুকে-বুকে গেছে অনেককাল—এখন বরং পরশুরাম কালোশশীকেই খুন করবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কিন্তু রঞ্জনের ওপর শ্রদ্ধা অবিচল আছে মেয়েটার। জেলাবোর্ডের বড় রাস্তার ধার থেকে জাম কুড়িয়ে ফেরবার সময় প্রায়ই ভেট দিয়ে যায় রঞ্জনকে।

বাস্তবিক, অদ্ভুত মেয়েটা। কেমন প্রক্ষিপ্ত মনে হয় যেন।

চলতে চলতে কানের কাছে কথাটা বাজতে লাগল: তাজা সাপ নিয়ে খেলতেই তো আরাম।—তাই বটে! প্রতি মুহূর্তেই টাটকা গোখরো সাপ খুঁজে ফিরছে কালোশশী। পরশুরামের মতো বিষধরেরা এসে জুটবে তার ঝাঁপিতে—ফণা দুলিয়ে দুলিয়ে খেলা করবে তার রূপোর কাঁকণ পরা হাতের তালে তালে, ছোবল মারবার ব্যর্থ চেষ্টায় আহত হয়ে হয়ে শেষকালে আত্মসমর্পণ করবে নির্জীব পরাজয়ে। আর তখনি সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তাকে—আবার শুরু হবে নতুন ক'রে সাপ খোঁজার পালা। নিষ্প্রাণ সাপ নিয়ে খেলতে ভালো লাগে না কালোশশীর।

ধান-সিঁড়ি পার হয়ে সাইকেলটা এতক্ষণে নেমেছে সমতলে। পেছনে টিলার ওপরে কালোশশীকে আর দেখা যাচ্ছে না।

ফেলে-আসা-পেছনের পৃথিবীটাকে হঠাৎ যেন ঢেকে দিলে সামনে হিজলবনীর জমিদার বাড়িটা; দূরে মাঠের ভেতর ঝকে উঠল মালিনী নদীর ক্ষীণ আঁকাবাঁকা রেখা। তারই একটা বাঁকের মুখে একপারে হিজলবন, অন্যপারে কুমার ভৈরবনারায়ণের দৌলতখানা।

ফাঁকা মাঠের ভেতর লাল-শাদা বাড়ীটা—যেন কোনো জন্তুর একটা রক্তাক্ত পাঁজর পড়ে আছে ওখানে। আশেপাশের দশখানা গ্রামের মালিক—বহু মানুষের দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় অধিপতি কুমার ভৈরবনারায়ণ

বাস করেন ওই বাড়ীতে। ধানসিঁড়ির দেশে, খোলা আকাশ আর অবারিত মাঠের মাঝখানে যারা মাটি কাটে আর ফসল ফলায়—ওই বাড়িটা তাদের হৃৎপিণ্ডের ওপর একটা ছোরার মতোই বিঁধে আছে সব সময়।

আর আপাতত ওই বাড়িতেই রঞ্জনের আশ্রয়।

চাকরিটা জুটে গেছে বিচিত্র উপায়ে। জেল থেকে বেরিয়ে বেকারের মতো ঘুরছিল এদিক ওদিক, এমন সময় কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ছেড়ে দিয়েছিল—পেয়ে গেল কাজটা। নামে প্রাইভেট সেক্রেটারী, কিন্তু কাজ গীতাপাঠ করে শোনানো। অফিং খেয়ে ঝিমুবার সময় গীতার শ্লোক না হলে কুমার বাহাদুরের নেশা জমেনা। আহা—গীতার মতো কি আর জিনিস আছে! মৃত্যুভয় ভুলিয়ে দেয়—আশা হয় বাহাল-তবিয়তে আবার এই পৈত্রিক জমিদারীতে আসীন হওয়া যাবে। কেননা আত্মার বিনাশ নেই:

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" –

অর্থাৎ কিনা—হে কৌন্তেয়, আত্মা অবিনশ্বর। অস্ত্র দ্বারা এ ছিন্ন হয়না, অগ্নিতে এ দগ্ধ হয়না—

আকুল হয়ে পড়ে রঞ্জন, বিভোর হয়ে শোনেন কৌন্তেয়। শুধু মধ্যে মধ্যে নাকের ডগায় দু একটা মাছি এসে বসাতে তন্ময়তার কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটে কুমার বাহাদুরের।

ঘোঁৎ করে গলায় একটা আওয়াজ বের করে বলেন: অ্যাঁ—কী বলছিলেন? কোথায় আবার আগুন লাগল?

মুখে আসে: তোমার ল্যাজে—কিন্তু প্রকাশ্যে বললে চাকরী থাকে না। সুতরাং বেশ ভদ্র ভাষায় জানাতে হয়: আজ্ঞে না, না, আগুন কোথাও লাগেনি। ওই গীতায় বলছে আর কি—মানে আত্মা কখনো দগ্ধ হয়না—

—যাক্, বাঁচালেন—সাধারণ মানুষের দেড়া মুখখানায় নিশ্চিন্ত একটা ভঙ্গি ছড়িয়ে আবার ঝিমুতে থাকেন ভৈরবনারায়ণ। মাঝে মাঝে গাল নড়ে ওঠে, যেন জাবর কাটছেন। আড় চোখে দেখতে দেখতে তোতা-পাখির মতো রঞ্জন শুরু করে : হে পাণ্ডুপুত্র—

কিন্তু এতদিন ধরে সে বোধ হয় অবিচার করছিল খানিকটা। যতটা ঘুমন্ত ভেবেছিল ভদ্রলোককে তিনি তা নন্। নেশার ঘোরেও চোখ মেলে রাখতে জানেন।

হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল : পাঁচটা। সর্বনাশ—এখনি চায়ের টেবিলে তার ডাক পড়বে! রঞ্জন দ্রুত সাইকেলটাকে চালিয়ে দিল।

তিন

পাহাড়ের মতো উঁচু ডাঙার ওপর থেকে ওই রকম বিচিত্রই দেখায় বটে বাড়িটাকে। কিন্তু কাছে এগিয়ে এলে ওর গতি একেবারে বদলে যাবে। দেখা যাবে, বাড়িটা একটা আকস্মিক নিঃসঙ্গতা নয়—তার সাত মহলায়, দ্বারী-দোবারিকে, পিলখানা আর গাবাড়ে, ঠাকুর-দালান আর বাই-নাচের রংমহলে একেবারে জমজমাট। দেউড়ির দারোয়ান সিদ্ধি ঘুঁটতে ঘুঁটতে রামলীলার গান গায়—অন্তঃপুর থেকে চড়া গলায় রেডিয়োতে গানের চীৎকার আসে।

লোক-লস্কর, আমলায় পেয়াদায় দস্তুরমতো রাজকীয় কারবার। মহাল নেহাৎ ছোট নয়, প্রায় ষাট হাজার টাকার জমিদারী। আগে আরো ছিল, কিন্তু মদিরা এবং মদিরাক্ষীদের অনুগ্রহে তার অনেকটাই বেহাত হয়ে গেছে। জমিদার ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ অবশ্য পিতৃপুরুষদের এই দুর্বলতার ইতিহাসটুকুকে স্বীকার করে নিতে রাজী নন। গোঁফে চাড়া দিয়ে বলেন, এক সময় দশ লাখ টাকার সম্পত্তি ছিল আমাদের। কাঞ্চনপুরের যুদ্ধে দিনাজপুরের মহারাজার সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছি আমরা।

—সে সম্পত্তি গেল কোথায়?—কোনো কোনো পাড়ুকার হয়তো মুগ্ধকণ্ঠে জানতে চায়।

—আরে, সে দেবীসিংহের আমলে।—শোনা কথাকে ইতিহাসের গাম্ভীর্য দিয়ে তার ওপরে রং বুলোতে থাকেন কুমার ভৈরবেন্দ্র, সংক্ষেপে ভৈরবনারায়ণ: দেবীসিংহ হল এ তল্লাটের ইজারাদার। জমিদারদের তখন যেমন লাঠির জোর, তেমনি টাকার তাকৎ—কথায় কথায় হাতে

মাথা কেটে আনে। দেবীসিংহ দেখল—এদের জব্দ না করলে আর চলছে না। কিস্তির টাকা এমনি চড়িয়ে দিলে যে তা দিতে দিতেই অনেকের জমিদারী সরকারী লাটে চড়ল। নইলে—হুঁঃ—হঠাৎ ভৈরবনারায়ণ নাকের ওপরে বসা মাছিটাকে হিংস্রভাবে থাবা দিয়ে ধরতে চেষ্টা করেন: নইলে এতকাল কি আর ইংরেজে রাজ্যশাসন করত। করতাম আমরা—আমরা।—মাছিটাকে ধরতে না পেরে উত্তেজিতভাবে একটা থাবড়া কষিয়ে দেন নিজেরই পেটের ওপরে।

সুতরাং শরীরে আপাততঃ আফিঙের জড়তা থাকলেও মনে জেগে আছে প্রচণ্ড ক্ষাত্র তেজ। গীতা শুনতে শুনতে কখনো কখনো তেতে উঠে কোমরের আলগা কশি দুটোকে বাধতে চেষ্টা করেন সজোরে। মনে হয় এক্ষুণি বুঝি যুদ্ধে চললেন। কিন্তু তা করেন না। হাত বাড়িয়ে গাণ্ডীবের বদলে ফরসীর নল টেনে নেন, তারপরেই তাঁর পাঞ্চজন্য বাজতে থাকে—মানে সারা বাড়ির লোক ভৈরবনারায়ণের ভৈরব নাসিকা নিনাদ শুনতে পায়; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটা হয় বটে, কিন্তু সেটা মাছিদের মধ্যে; কৌরবরাজ্য অধিকার করবার জন্যে নয়—তাঁর নাসিকাগ্র দখল করবার সুমহান্ প্রেরণায়।

তবুও বেশ বড় জমিদার। বাইরে প্রচুর নাম-ডাক আছে। এই জমিদারীর এলাকাতেই গোটা কয়েক বড় বড় বিল রয়েছে—অগ্রহায়ণ থেকে বুনো হাঁসের মচ্ছব পড়ে যায় সেখানে। কুমার ভৈরবনারায়ণ বৈষ্ণব, তাঁর বিলে কারও পাখি শিকার করবার নিয়ম নেই। কিন্তু নিয়ম নেই বলেই তার ব্যতিক্রম আছে। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব প্রতি বছরই শিকারের জন্য এখানে এসে তাঁবু পাতেন, কখনো কখনো আসেন ডিভিশন্যাল কমিশনার—বছর বারো আগে লাট সায়েবও একবার এসেছিলেন। সেই স্মরণীয় দিনটির কথা যখনই মনে পড়ে, সেই মুহূর্তেই

বীররসোদ্দীপ্ত কুমার ভৈরবনারায়ণের হৃদয় হঠাৎ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে যায়। কৌন্তেয় আর সামনে কুরুসৈন্য দেখতে পান না; সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

—আহা—অমন সাহেব আর হয় না!

—খুব ভালো সাহেব বুঝি?—মুগ্ধ চাটুকার নূতন করে জানতে চায় হাজার বার শোনা সেই পুরোনো গল্পের পুনরাবৃত্তি—রোমাঞ্চিত হতে চায় সাহেবের প্রায় অলৌকিক অপূর্ব চরিত্র গাথা শ্রবণ করে।

—ভালো মানে?—কোমরের কষি আঁটতে আঁটতে আবার উঠে পড়েন ভৈরবনারায়ণ: একেবারে খাসবিলিতী জিনিস, বুঝলে! ভেজাল নেই কোথাও। কী লম্বা চওড়া আর ক্যায়সা লাল টকটকে চেহারা! কথা তো বলে না—যেন বজ্রের ভাবে ষাঁড়ের মতো গাক গাক করে ওঠে। আর খাওয়া! একাই একখানা দেড়সেরী খাসির রাং মেরে দিলে। হ্যাঁ—একেবারে খাঁটি-সাহেব, অমন লাট দেখলেও পুণ্যি হয়।

চাটুকারের স্বরে মুগ্ধতা এবার উচ্ছ্বাস হয়ে গলে পড়ে। তা বা বলেছেন।

—এখনো সব বললাম কই!—কথার মাঝখানে বাধা পড়ায় চটে ওঠেন কুমার বাহাদুর: তুমি তো বড্ড ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করো হে। ভারী বাধা দাও।

চাটুকার কাঁচু মাচু মুখ করে বসে থাকে।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম।—সভা শাসন করে আবার শুরু করেন ভৈরবনারায়ণ: তখন বাবা বেঁচে। লাটসায়েব বাবার পিঠ থাবড়ে দিয়ে বলেছিল, ইউ আর এ ভেরি লয়্যাল্ সাব্জেক্ট। বাবা আবার এক থলি গিনি দিয়ে ওঁকে প্রণাম করেছিলেন কিনা!

চাটুকার আবার কী যেন বলবার জন্যে মুখ খোলে, কিন্তু কুমার বাহাদুরের একটা রুদ্র দৃষ্টি তার ওপর এসে পড়তে কেমন থেমে যায় থতমত খেয়ে। যে শব্দটা প্রায় ঠোঁটের সামনে এসে পৌঁছেছিল, অদ্ভুত কৌশলে সামলে নেয় সেটাকে—খানিকটা হাওয়া আচম্‌কা গিলে খাওয়ার মতো কোঁৎ করে একটা শব্দ হয় গলায়।

আজও চায়ের আসরে তারই জের চলছিল।

এই সময়টাতেই একটু প্রকৃতিস্থ থাকেন কুমার বাহাদুর—আফিমের মৌতাতটা ফিকে হয়ে আসে। নেশা ছেড়ে-যাওয়া শিথিল শিরাগুলোর মধ্যে যে মন্থর অবসাদ ঘনিয়ে থাকে, তাকে সতেজ করে তোলবার জন্যেই যেন ভৈরবনারায়ণ এই সব গল্প শুরু করেন—হাজার বার বলা হিউমারের পুনরাবৃত্তি করে আবহাওয়াটাকে সজাগ করে রাখবার প্রয়াস পান।

একটুকরো কাটা পেঁপে চামচেতে তুলে নিয়ে বলেন, আমি একবার ঘোড়ায় চড়েছিলুম—বুঝলেন ঠাকুরবাবু!

স্বাভাবিক বিতৃষ্ণ অনুভূতির মধ্যেও গলার স্বরে কেমন করে যে একটা কৌতূহলের আমেজ এসে যায় সেটা রীতিমতো বিস্ময়কর। হঠাৎ কোথাও একটা আঘাত লাগলে তড়িৎগতি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মতো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। মাঝে মাঝে তার পাগলা একটা হিন্দুস্থানীর কথা মনে পড়ে—লোকটা পুলিশের কন্‌স্টেবল ছিল এক সময়। 'পুলিশ সাহেব' শব্দটা কানে গেলেই যেখানে যে অবস্থাতেই সে থাক—ফিরে দাঁড়িয়ে খটাস্ করে সেলাম ঠুকত একটা।

সঙ্গে সঙ্গে চকিত হয়ে রঞ্জন বলে, তাই নাকি? বলুন—বলুন।

ভৈরবনারায়ণ চারদিকে তাকিয়ে নেন একবার। লক্ষ্য করেন সকলের চোখ তাঁর ওপর উদগ্র আর সজাগ হয়ে আছে কিনা—সকলের মুখে ফুটে উঠছে কিনা জ্বলন্ত কৌতূহল। তারপর শুরু করেন:

—বুঝলেন, বাবা সেবার নেকমদনের মেলা থেকে কিনে আনলেন এক ভুটানী ঘোড়া। যেমন তাকৎ, তেমনি চাল। কিন্তু কে জানত ঘোড়াটার মাথা খারাপ। যেমনি চেপে বসেছি, অমনি—সবাই এর মধ্যে হাসতে শুরু করেছে। যাদের কোনোমতেই হাসি পায়নি, তারা যে-কোনো একটা মারাত্মক হাসির কথা ভেবে নিয়ে অন্তত একটুকরো হাস্যরেখা ফোটাবার প্রাণান্তিক চেষ্টা পাচ্ছে ঠোঁটের আগায়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মানুষগুলো পাগল হয়ে গেছে নিশ্চয়। নইলে এমন অর্থহীন ভাবে কেউ হাসির প্রতিযোগিতা চালাতে পারে এ অবিশ্বাস্য।

তবু কখনো যেন কেমন একটা সন্দেহ জাগে রঞ্জনের।

হঠাৎ মনে হয় কুমার বাহাদুর বড় বেশি ক্লান্ত—বড় বেশি হতাশায় আচ্ছন্ন তাঁর মন। আফিংটা তার আত্মরক্ষার একটা প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়—যেমন তীব্র যন্ত্রণার ওপর মলিনার প্রলেপ। কিন্তু সে মলিনার নেশা যখন কাটে তখন যেমন যন্ত্রণায় শরীরের নাড়ীগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চায়, সেই রকম কুমার বাহাদুরও নেশার শেষে নিজের নিরুপায় নিরাশাকে আড়াল করতে চান ওই পুরোনো রসিকতার সুড়সুড়ি বুলিয়ে। সেটাকে তার হাস্যভরা মুখ মনে হয়, আসলে সেটা হয়তো মুখোস মাত্র।

কিন্তু কেন এমন হয়?

পচন ধরেছে নিজের মধ্যে? বহুকাল ধরে মানুষের হাতে গড়ে তোলা কীর্তিস্তম্ভে ফাটল ধরেছে কি প্রাকৃতিক নিয়মেরই অনুসরণে? কালের ঝোড়ো হাওয়ায় ক্ষয়ে যাচ্ছে উত্তুঙ্গ গ্রানাইটের শিলাস্তর? হঠাৎ কি টের পাচ্ছেন পায়ের নিচের মাটিটা আসলে চোরাবালি—এতদিন পরে সরতে শুরু করেছে একটু একটু করে? কিংবা যে আসনটিকে এতকাল তারা রাজত্ব করবার জন্যে নিশ্চিন্ত ময়ূর সিংহাসন বলে মনে করেছিলেন—দেখা

যাচ্ছে সেটা কোনো সুপ্ত আগ্নেয়গিরির ক্রেটার—এতদিন পরে ধুঁইয়ে উঠছে কোনো রুদ্র-সংকেতে ?

অথবা এসব কিছুই না—সবটাই তার নিছক ভাব-বিলাস ? নিজের দৃষ্টির রং দিয়ে স্থূলবুদ্ধি একটা আফিংখোর মাংসপিণ্ডকে মননময় করে তোলা ?

ভাববার সময় পাওয়া যায়না—ইতিমধ্যে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলেছেন কুমার বাহাদুর। আরম্ভ করেছেন আর একটি চাঞ্চল্যকর বিষয়বস্তু : আপনারা কেউ ভূত দেখেছেন ?

—ভূত !

—হ্যাঁ-হ্যাঁ।—গাল নাচিয়ে নাচিয়ে হাসেন ভৈরবনারায়ণ : জিন, প্রেত, কন্ধকাটা, এই সব। ঠাকুরবাবু, আপনিও কি কিছু দেখেননি ?

এক মুহূর্তে রঞ্জনের মনে আসে তার ছেলেবেলার দেশকর্মী অবিনাশ-বাবুর স্মৃতি। আত্রাইয়ের বানে রিলিফ করতে গিয়ে প্রাণ দেন। তবু ডাহুক-ডাকা এক কালীসন্ধ্যেবেলায় রঞ্জন তাঁর অদৃশ্য গলার ডাক শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মত কোথায় যেন চলে গিয়েছিল ! জীবনে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা !

কিন্তু এই স্থূলতার আসরে সে বেদনা-রোমাঞ্চিত স্মৃতিটাকে উদ্ঘাটন করতে তার ইচ্ছে হয় না। মাথা নেড়ে বলে, না, আমি কিছু দেখিনি।

—কিছুই না ?

—না—আরো সংক্ষেপে জবাব দিয়ে মুক্তি পেতে চায় রঞ্জন।

—তা হলে আমি জিতেছি আপনার চাইতে—ভৈরবনারায়ণের চোখে মুখে এবার সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে পরম আন্তরিক একটি আত্মপ্রসাদ : হুঁ-হুঁ —এবারে হারিয়েছি আপনাকে।

গীতা-পড়ুয়া পণ্ডিতকে হারানোটা গৌরবের ব্যাপার নিশ্চয়। মন

চায়না কুমার বাহাদুরের সে গর্বটাকে খর্ব করতে। প্রসন্নমুখে বলে, বেশ তো, বলুন।

তখন কুমার বাহাদুর কোনো এক চণ্ডীতলার মাঠে নিশীথ রাত্রে দেখা ভূতের গল্প আরম্ভ করে দেন। ফুটফুটে ভরা জ্যোৎস্নায় নির্জন মাঠে সে পঞ্চাশ হাত লম্বা দুখানি বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিল—আর সেই সঙ্গে কী যেন খুঁজে ফিরছিল অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে। বয়ান দিয়ে কুমার বাহাদুর বলেন: তার আঙুলের নোখগুলো জ্বলে জ্বলে উঠছিল এক একটা ধারালো ছোরার মতো—

হাসির গল্প, ভূতের গল্প, আফিং। সমস্ত শরীরটা সঙ্গতি আর শৃঙ্খলাহীন একটা বিসদৃশ মাংসপিণ্ড। কানের কাছে প্রতিদিন গীতাপাঠের দুঃসহ অভিনয়। বিচিত্র। একটা অদ্ভুত অসঙ্গতির জগতে যেন কৃত্রিম উপায়ে লোকটা বেঁচে আছে। মৃত্যুমুখী মানুষ নাভিশ্বাস টানছে অক্সিজেন টিউবের সহায়তায়!

কিন্তু রক্তে রক্তবীজেরা মরেও ফুরোয় না। দেবীসিংহের সাধ্য কি তাদের বিনাশ ঘটায়! আজও স্বাভাবিক নিয়মে সবটা চলছে হঠাৎ আলোচনা বাঁক নিলে একটা।

কথাটা বলে বসলেন রাজা সূর্যনারায়ণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার পান্নালাল মণ্ডল। সাইনবোর্ডে তিনি নিজের নামের পাশে বসিয়েছেন—এল্-এম্-এফ্, ব্র্যাকেটে 'পি'। 'পি' মানে প্রাকড্—একথা তিনি নিজে বুঝিয়ে না দিলে কারুই বোঝবার উপায় নেই—বরং কোনো একটা বাড়তি উপাধি মনে করে গেঁয়ো লোক আরো বেশি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে।

ভৈরবনারায়ণ একটা হাই তুললে দশবার তুড়ি দেন ডাক্তার পান্নালাল মণ্ডল এল্-এম্-এফ্ ব্র্যাকেটে 'পি', আজ কিন্তু তিনিই রসভঙ্গ করলেন।

—একটা খবর শুনে এলাম হুজুর।

কুমার বাহাদুর তখন সবে তাঁর ভয়ঙ্কর ভূতের গল্পটা শেষ করে ভীষণ ভঙ্গিতে তাঁর শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, দেখতে চাইছেন ভয়ে তাদের কারুর গা দিয়ে ঘাম ছুটছে কিনা। এমন সময় ডাক্তারের এই অবান্তর কথাটায় তিনি ভ্রূকুটি করলেন।

ডাক্তার ঘাবড়ালেন না। কারণ খবরটা জরুরি। এতক্ষণ ধরে বলবার জন্যে তাঁর জিভ নিস্‌পিস্‌ করছিল, কিন্তু ভৈরবনারায়ণের গল্প বলবার তোড়ে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি আর কোনোখানে সুবিধেমতো একটা ফাঁকখুঁজে পাচ্ছিলেন না।

—তুরীদের একটা পঞ্চায়েত বসেছিল কালাপুখ্‌রিতে।

—কালাপুখ্‌রিতে তুরীদের পঞ্চায়েত!—এবারেও ভৈরবনারায়ণ ভ্রূকুটি করলেন, কিন্তু তার জাত আলাদা। এতক্ষণ ধরে ঝাঁপির মধ্যে যে সাপটা আফিঙের নেশায় ঝিমুচ্ছিল, সে হঠাৎ খোঁচা খেয়ে ফোঁস্‌ করে উঠল।

—ব্যাটারা ভয়ঙ্কর পাজী—আর ওই সোনাই মণ্ডল—চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ভৈরবনারায়ণ: পঞ্চায়েত বসলেই একটা না একটা কুমৎলব বার করে ছাড়বে। কয়েকটাকে দিলাম—বি-এল্‌ কেসের আসামী করে ফাঁসিয়ে, তবু যদি একটু হুঁশিয়ার হয় ব্যাটারা। ওদের মাথাগুলো আবার বড় হয়ে উঠেছে দেখছি, ভালো করে ছাঁটাই করতে হবে আর একবার। হিংস্র স্বগতোক্তিটা শেষ করে জানতে চাইলেন: কিন্তু পঞ্চায়েত কেন?

—কামারহাটির ডাঁড়ার জন্যে।

—বটে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা ঠিক করেছে, তিন চারশো মানুষ কোদাল ধরে এবার ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করে দেবে—ওদিক দিয়ে আর জল বেরুতে দেবেনা।

—বটে—বটে ! কুমারবাহাদুরের স্বরে মর্মঘাতী ব্যঙ্গের আভাস ফুটে বেরুল : হঠাৎ এ রকম সাধু সংকল্প কেন তাদের ?

—সে তো তারা হুজুরে জানিয়েছে।

—হুঁ !—কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে থেকে ভৈরবনারায়ণ বললেন, কারণটা আমি শুনেছি। ওরা বলে খালের জল ওই ডাঁড়ার মুখ দিয়েই আজকাল বেরিয়ে যাচ্ছে, ফলে ওদের ফসলী জমি ডুবে যায়।

—আজ্ঞে তা নেহাৎ অন্যায় বলে না—সাহসে ভর করে পোস্টমাস্টার বিভুপদ হাজরা জানালো। কালাপুখুরির দিকে তার নিজেরও কিছু ধানী আছে, তাই ক্ষতিটা তার গায়ে লাগছিল।

—আরে রাখো ওসব বাজে কথা—কুমারবাহাদুর চটে উঠলেন ' দু-চার কাঠা ধানী জমি ডুবলেও ডুবতে পারে, সেটা এমন মারাত্মক ব্যাপার নয়। কিন্তু আমার ক্ষতি কী রকম, সে জানো ? ওই ডাঁড়া দিয়ে জল না নামলে আমার ফিরিঙ্গিপুর আর হাসমারীর বিল ভরবেনা বছরে তিন হাজার টাকার জলকর বেমালুম বরবাদ। অমন বাজে আবদার করলে আমি শুনবনা—ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব—সংকল্পে ভয়াল শোনালো তাঁর গলা।

—কিন্তু ওরা তো বলে তিন চার কাঠা নয়, প্রায় তিন হাজার বিঘে জমির ফসল ওই ডাঁড়ার জলে নষ্ট হয় !—আবার দীনতম প্রতিবাদ ঘোষণা করল বিভুপদ।

—তার মানে ? তাহলে কি তুমিই ওদের ক্ষেপিয়ে তুলছ ?—মুহূর্তে সমস্ত চক্ষুলজ্জার আড়ালটা সরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট গলায় সরল প্রশ্ন করলেন ভৈরবনারায়ণ।

বিভুপদ এক মুহূর্তে মাটিতে মিলিয়ে গেল। হেলে সাপের মতো

নির্বিষ ভাবে একটু আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছিল, এবারে যেন কেন্নো হয়ে গুটিয়ে গেল নিজের চারপাশে।

—ছিঃ ছিঃ—এটা কী করে বললেন হুজুর। এমন বেয়াদবী আমি কখনো ভাবতে পারি?

—কী জানি, কিছুই বলা যায় না—কুমারবাহাদুর হঠাৎ বিচিত্রভাবে দৃষ্টিটা রঞ্জনের নির্বাক মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেন। আর তখনি রঞ্জন বুঝতে পারল। আসলে বিভুপদ তাঁর উপলক্ষ, লক্ষ্যটা অন্যত্র।

আফিংয়ের নেশায় ঝিমন্ত চোখ কি নিছক একটা ভান?

একবারের জন্যে বুকের ভেতরটা নাড়া খেয়ে উঠে পরক্ষণেই স্থির হয়ে গেল তার। আত্মগোপনের চেষ্টা করে লাভ নেই আর। পরশু কুমারবাহাদুর জয়গড়ের ব্যাপার নিয়ে একটা নিরসক্ত মন্তব্য করেছেন, আজও বিভুপদকে সাবধান করে দিতে গিয়ে তার দিকে হয়তো বা বিনাকারণেই দৃষ্টিক্ষেপ করলেন একটা। কিন্তু অনেক বলার চাইতে এই না বলা দৃষ্টির সংকেত অনেক বড় ঝড়ের প্রতীক্ষা করতে থাকে, এ অভিজ্ঞতা নেহাৎ কম হয়নি জীবনে।

তবু যখন কুমারবাহাদুর একটা ছলনার মুখোস টেনে রেখেছেন, তখন নিজেকেও সে সুস্পষ্ট করে ধরা দিল না। পরস্পরের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বার আগে আরো কিছুক্ষণ ধরে না হয় চলুক না মৈত্রীর ছদ্ম-অভিনয়। বাঁ হাতে ছোরা লুকিয়ে ডান হাতে করমর্দনের পর্ব।

রঞ্জন মাথা নাড়ল। কুমারবাহাদুরের দৃষ্টির উত্তরে মাথা নেড়ে জবাব দিলে, ঠিক।

আলোচনাটা আবার হয়তো শুরু হত পূর্ণোদ্যমে। একটা বক্সিং রিংয়ের ভেতর পরস্পরকে আঘাত করবার আগে চলত আরো খানিকক্ষণ সন্ত্রস্ত পদচারণা। কিন্তু ছেদ পড়ল হঠাৎ।

একজন হিন্দুস্থানী পাইক প্রবেশ করল ঝড়ের বেগে।

—হুজুর, জটাধর সিং খুন হো গিয়া!

—কেয়া!—চর্বির প্রকাণ্ড পিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল একটা টেনিস বলের মতো: কেইসে খুন হুয়া? কোন খুন কিয়া?

—মালুম হোতা কি ই গোয়ালা আদমীকে কাম হ্যায়। সব্ একদম চকনাচুর করকে জঙ্গল মে মুদা ফেক্ দিয়া—

—কাঁহা মুদা?—ভৈরবনারায়ণ গর্জন করলেন।

—লে আয়া—দেখিয়ে আপ—রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলে পাইকটা।

—চলো—ভৈরবনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। এখনো মৌতাতের আফিং কাটেনি, চোখদুটো বাঘের মতো কপিশ আলোয় জল জল করে উঠছে তাঁর।

বেশ নিপুণ হাতেই খুন করেছে লোকটাকে।

অতবড় জোয়ান হিন্দুস্থানীটার পাথুরে মাথাটাকেও গুঁড়ো করে ফেলেছে বাজের মতো নিষ্ঠুর লাঠির ঘায়ে। বীভৎস বিকৃত মুখে রক্ত আর কাদার প্রলেপ। শুধু লাঠি নয়—দু চার জায়গায় টাঙ্গিও চালিয়েছে মনে হয়। বক্রফলক সেই ধারালো টাঙ্গির আঘাত হাঁ করে আছে ঘাড়ের ওপর। কোনোমতেই বাঁচতে দেওয়া যাবে না—এই সংকল্প নিয়েই জটাধর সিংকে খুন করেছে নির্মম ভাবে।

দৃশ্যটার পৈশাচিকতা কয়েক মুহূর্ত পাথর করে রাখল সকলকে। এ হত্যা যেন মানুষে করেনি, এই নিধনের ভেতরে কোথাও যেন চিহ্ন নেই মানবিক কোমলতার; স্তব্ধ কোনো রক্ত সমুদ্রের মতো 'বরিন্দের' বন্য মৃত্তিকায় এ যেন একটা প্রাকৃতিক-জিঘাংসা। যেন আচমকা ঝড়ের ঝাঁপটায় কোনো দিগন্ত-প্রহরী তালগাছ ধ্বসে পড়ে একটা মানুষকে নিষ্পিষ্ট করে ফেলার মতো—বুনো-শূয়োরের দাঁতে কোনো ছিন্নোদর অপমৃত্যুর বিভীষিকার মতো। এদেশের মাটিতে এই মৃত্যুই যেন স্বাভাবিক, সব চাইতে যুক্তি-সঙ্গত।

খানিকক্ষণ কেটে গেল। স্তব্ধতা চেপে রইল জগদ্দল-পাথরের মতো।

রঞ্জনই কথা বললে তারপরে।

—একটু ভুল হয়েছে বোধ হয়?

—কী ভুল?—এমন একটা দৃষ্টিতে ভৈরবনারায়ণ তাকালেন যে তার ব্যাখ্যা হয় না।

কিন্তু ও দৃষ্টিকে ভয় পাবার বয়েস তার কেটে গেছে উনিশশো

তিরিশ সালে। ওর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুধিত চোখে তাকে গিলে খেতে চেয়েছিল ধনেশ্বর—বিপ্লবী যুগে সেই আই বি ইন্‌সপেক্‌টার। একটা ছোট বলের মতো হাতের ওপর লোফালুফি করেছিল ছয় চেম্বারের লোড্‌ করা রিভলভারটাকে—রাইডারের হিংস্র চামড়াটা বাতাস কেটেছিল তীক্ষ্ণ শোঁ শোঁ শব্দে।

সমান দৃষ্টিতেই রঞ্জন তাকালো ভৈরবনারায়ণের চোখের দিকে।

—বডিটা তুলে আনা উচিত হয় নি। পুলিশে খবর দিলেই ভালো হত।

—পুলিশ!—ক্রূর ভ্রূকুটি ফুটল ভৈরবনারায়ণের মুখে। তারপর মৃতদেহটার দিকে আগ্নেয় দৃষ্টি ফেলে বললেন, সে খবর একটা দিতে হবে বটে। কিন্তু: একবার থামলেন, বললেন, ভাবছি এর শেষ কোথায়।

আবার স্তব্ধতা। কালান্তক ক্রোধে পাথর হয়ে রইলেন ভৈরবনারায়ণ।

—মুর্দা, বাবু?—সভয়ে জিজ্ঞাসা করল একজন।

—থাক ওখানেই। থানায় একটা খবর দিয়ে আয়। তারা ওটা নিয়ে যা খুশি করুক। কিন্তু আমাদের কাজ শুরু করতে হবে এবার।

পায়ের ভারী চটিটার শব্দ করে কুমারবাহাদুর ভেতরে চলে গেলেন।

রাত্রে নিজের ঘরে বসে কিছু একটা পড়বার চেষ্টা করছিল রঞ্জন।

গুরুভার বই। লাল পেন্‌সিল দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে মার্জিনে নোট করে পড়তে হয়। কিন্তু আজ আর ওই তর্ক-তত্ত্বের অরণ্যে সে ঢুকতে পারল না। মাথাটা কেমন ভারী হয়ে আছে. পড়তে পড়তে বার বার ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। বইয়ের পংক্তি হঠাৎ যেন ছন্দ-শৃঙ্খলা হারিয়ে একটা আর একটার ঘাড়ে এসে পড়ছে। অসম্ভব।

উঠে দাঁড়ালো সে। বাইরের কৃষ্ণা রাতের মধ্যযাম। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে সে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে।

তার ঘরখানা বিশাল বাড়িটার এক প্রান্তে। সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির। পূজোর মরশুমগুলো ছাড়া এ মহলটা অনাদরেই ম্লান হয়ে থাকে। মাকড়শার জাল আর রাশি রাশি ঝুলে আবৃত হয়ে যায়, বাঁধানো বেদীর ফাটলে বর্ষার ডুবো মাঠ থেকে দু একটা গোখরো সাপ এসে বাসাও বাঁধে কখনো-কখনো। আর চাপ চাপ অন্ধকার-জড়ানো মণ্ডপের কোণায় আরো ঘন টুকরো টুকরো অন্ধকারের মতো চামচিকে ঝুলে থাকে—বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়, আর দিনান্তিক পাণ্ডুরতা চারদিকে সঞ্চারিত হয়ে এলে কতকগুলো প্রেতসত্তার মতো কদাকার ডানা ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে সামনের আমবাগান আর নদী পার হয়ে কোথায় উড়ে যায় কে জানে!

নিজের নির্জন ঘরটিতে বসে বসে রঞ্জন এক একটা সন্ধ্যায় তাদের ডানার শব্দ শোনে। কী যেন একটা অদেহী অস্তিত্ব সঞ্চরমান অন্ধকারকে মুখর করে তোলে। মনে হয়: দেবীসিংহের আমল, অথবা তারও অনেক আগে থেকে এই বাড়িতে বসে যারা জমিদারী করেছে, তারা এখনো এখানকার মায়া কাটাতে পারেনি; চাম্‌চিকে হয়ে যক্ষের মতো এ বাড়ির প্রতিটি ইট পাথরকে চলেছে পাহারা দিয়ে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে পুরোনো অভ্যাসের তাগিদে তারা বেরিয়ে পড়ে। নদী পার হয়ে, মাঠ পার হয়ে তারা চলে যায় গ্রামে গ্রামে—তমসার মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে—চাম্‌চিকে নয়—ভ্যাম্পায়ার হয়ে মানুষের রক্ত শুষে খায়।

হঠাৎ ভয় করে। মনে হয় তারও চারদিকে যেন চক্র দিয়ে ফিরছে এই চাম্‌চিকেরা। লণ্ঠনের বিমর্ষ হল্‌দে আলো পড়ে দেওয়ালে

—নতুন জিনিস দেখতে পায় একটা। পুরোনো বাড়ি, কতকালের পুরোনো এই দেওয়াল। তার গায়ে এলোমেলো ভাবে অজস্র শ্যাওলার বিসর্পিল সবুজ রেখা পড়েছে। ওই রেখাগুলো হঠাৎ যেন কতগুলো মুখ হয়ে ওঠে—যেন চামচিকের ডানার শব্দে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে তারা। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক কতগুলো মুখ—এই মুমূর্ষু প্রাসাদের তারা মৃত প্রতিহারীর দল। ফিস্ ফিস্ করে তাদের কথা বলবার শব্দও যেন স্পষ্ট কানে আসে—বাইরের আমবাগানে বাতাস মর্মরিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে, এই সহজ প্রত্যক্ষ সত্যটাকেও যেন বিশ্বাস করা যায় না কিছুতে।

এই ভয়! একে ভাঙতে হবে। চুরমার করতে হবে এই প্রেত-পূজোর বেদীকে। ছাদভাঙা খানিকটা তীব্র তীক্ষ্ণ সূর্যের আঘাতে মিলিয়ে ছায়া হয়ে যাবে এই চামচিকেরা। আজও মানুষের মনের ওপরে এরা ভর করে আছে—প্রেতের ভর! আজও কুমারবাহাদুরের আটটা বন্দুক আর আটত্রিশজন পাইক পাহারা দিচ্ছে এই পিশাচতন্ত্রকে। কিন্তু কতদিন আর?

কতদিন আর? ঘরের দেওয়ালে সরীসৃপ মুখাকৃতিগুলোর দিকে সে তাকালোনা—তাকালোনা সবুজ শ্যাওলায় আঁকা সেই বীভৎস প্রেতসত্তাগুলোর দিকে—উড়ন্ত চামচিকের পাখার শব্দ যাদের জাগরণের সংকেত। এখন অনেক রাত। জানালা দিয়ে সে বাইরে সেদিকেই তাকিয়ে রইল—নদীর ওপারে যেখানে পূব দিগন্ত; যেখানে আগুনের পদ্মের মতো সূর্য উঠে তার বিছানার ওপরেই সর্বপ্রথম তার আলো ছড়িয়ে দেয়।

প্রভাতী সীমান্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল।

পিশাচ মন্দিরের পাথর ধ্বসছে। তুরীদের পঞ্চায়েত বসেছে কালা পুখরিতে। কামারহাটির ভাঁড়ার মুখে জল নামতে দিয়ে তারা আর

সর্বনাশ করবে না তিন হাজার বিঘে ফসলী জমির। জমিদারের ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারীর জলকর না ভরলেও তাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই —এবার রুখে দাঁড়িয়েছে তারা। ওদিকে সাঁওতালেরা বুনোশূয়োর মারতে শিখছে—টুলকু সাঁওতালের ছেলে ধীরু সাঁওতাল ধানসিঁড়ির আল্‌পথে খেলা করে বেড়ানো কেউটের শিশুর মতো বিষ সঞ্চয় করছে আস্তে আস্তে। আর তাদের সঙ্গে আজ বাহু মিলিয়েছে 'ডুবা'র ঘোষেরা—বাজের মতো লাঠির মুখে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে লোহা-পেটা জোয়ান জটাধর সিংয়ের ইস্পাতী মাথাটা!

একটা ছবি মনে পড়ল হঠাৎ।

—হোই বাবু, সামাল।

সাইকেলে করে আসছিল। পেছন থেকে আবার ডাক এল: সামাল বাবু, সামাল।

কী ব্যাপার? এমন ভাবে সাবধান করে কে?

চারদিকে তাকাতেই ব্যাপারটা বোধগম্য হল তার কাছে।

চৈত্রের মাটি ফাটানো রোদে শুকিয়ে একেবারে খড় হয়ে গেছে চারদিকের বুক সমান উঁচু ইকড়, বিন্না আর শন ঘাসের বন। সেই বনে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সামনে, পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে ধূ ধূ করে জ্বলছে শুকনো ঘাস, কালো ধোঁয়া কুণ্ডলিত হয়ে উঠছে আকাশে। যেন চারদিক থেকে একটা অগ্নিবৃত্ত আসছে ঘিরে ঘিরে।

—সামলে বাবু। আগুনের ভেতর গিয়ে পড়িস্ না।

সেই আগুনটা যেন আজও আসছে এগিয়ে। কিন্তু ঘাসবন নয়। দাবাগ্নি।

—মচ্—মচ্—মচ্

নাগ্‌রা জুতোর শব্দ। কাঁচা চামড়ার আওয়াজ। ওদিকের লম্বা

বারান্দাটা দিয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছে একটা লণ্ঠনের আলো। মুখ ফিরিয়ে দেখল। প্রহরী। জমিদার বাড়ি পাহারা দিয়ে ফিরছে। ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠির শব্দ পাওয়া গেল, বারকয়েক শোনা গেল কুঁই কুঁই করে খানিকটা কাতরোক্তি। দারোয়ানের লাঠির ঘা খেয়ে একটা ঘুমন্ত কুকুর পালিয়ে গেল বারান্দা থেকে।

আবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল নিশীথ দিগন্তের দিকে। একটা ভোঁতা ছুরির মতো তমসাস্তীর্ণ নদীটা বয়ে যাচ্ছে। ওপারের মাঠটার শেষপ্রান্তে একটা মস্ত বড় আলো—কারা একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছে যেন। ঠিক তারই ওপরে আকাশে একটা জ্বলজ্বলে প্রকাণ্ড তারা। ওই তারাটা থেকে খানিকটা আগুন মাটিতে ছিটকে পড়েই কি জ্বলে উঠেছে অমন দাউ দাউ শব্দে?

নক্ষত্রের আলো, না আগামী দিনের সংকেত। আকাশের সীমান্তে সীমান্তে যেন ভবিষ্যৎ দিনের প্রত্যাশা। কোথা থেকে কি দলে দলে মানুষ মশাল হাতে আসছে এগিয়ে? পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ— প্রতিটি প্রান্ত থেকে পদক্ষেপ করেছে মশালধারী সৈনিকের দল। আসছে— এগিয়ে আসছে।

আচ্ছা—ওই দিকে, নদীর ওপারে ওই অগ্নিকুণ্ডটার কাছাকাছিই কোথাও কি গোয়ালাদের সেই গ্রাম নয়? সেই গ্রাম—যেখানে লাঠির ঘায়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে জটাধারী সিংয়ের মস্ত শক্ত মাথাটা? আর শুধু তারই মাথা নয়—সে চোটটা সোজা কুমার ভৈরবনারায়ণেরও ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে?

হ্যাঁ—ওদের দেখেছে রঞ্জন। বরিন্দের আরণ্য মৃত্তিকায় চিনেছে আর একটি দুর্ধর্ষ শক্তিকে। মাথা নোয়ায় না—হার মানতে জানে না। খোলা মাঠ আর খোলা হাওয়ায়, পোষা মহিষের ক্ষীরের মতো ঘন দুধ

খেয়ে খেয়ে দরজার কপাটের মতো চওড়া তাদের বুক, প্রতিটি পাঁজর লোহার আগল। 'শাল-প্রাংশু মহাভুজ' আর পুঁথির জগতে বেঁচে নেই, তা নেমে এসেছে জনগণের পৃথিবীতে,—পৌরাণিক ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবান বিপুল সত্তা আজ ওদের মধ্যেই সার্থক হয়েছে—পেয়েছে সর্বোত্তম পূর্ণতা।

আগে ঘর ছিল পশ্চিমের মাটিতে। রক্তের মধ্যে কোন্ আদিম যাযাবরী প্রেরণায়, কোন্ জমিদারের অত্যাচারে গ্রাম-নগর-নদী-পাহাড়-বন পেরিয়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে কে জানে। কিন্তু শুধু বাসাই বাঁধেনি—শক্ত করে শিকড় মেলেছে মাটিতে—সাঁওতালদের মতো সহজে উৎপাটিত হয়ে যাবে এমন শিথিল মূল নয় এদের। হাতে এদের দশ থেকে বারো হাত পর্যন্ত লম্বা লাঠি; তার গিঁটে গিঁটে পিতলের তার জড়ানো, বছরের পর বছর সর্ষের তেলে পাকানো। লোহার মতো তা দৃঢ় আর নির্মম—তার দণ্ড চরম দণ্ড।

রঞ্জনকে দেখে খুব অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ঘোষেরা।

অদ্ভুত ভাষা বলে। খানিকটা ভাষা হিন্দী, খানিকটা বাংলা। কিছু কিছু সাঁওতালী আর ওঁরাওঁ ভাষার খাদ তার সঙ্গে। রঞ্জনের মনে হয়েছিল বেশ চমৎকার একটা সর্বজনীন ভাষা তৈরী করে ফেলেছে এরা—রাষ্ট্রভাষার সমস্যা ফেলেছে মিটিয়ে।

—ঠাকুর বাবু, নমস্তে।

—নমস্তে। কী খবর তোমাদের?

—খবর খুব আচ্ছাই।—ঘোষেদের মুরুব্বি যমুনা আহীর বলেছিল: লেকিন্ থোরা থোরা গণ্ডগোল হচ্ছেন।

—কী গণ্ডগোল হচ্ছেন আবার?

—বলছি ঠাকুর বাবু। আপনি আচ্ছা আদমি আছেন, আপনি সমঝাবেন। তো আগে আসেন, একটু তামাকু খেয়ে যান।

—আমি তো তামাক খাই না।

—তো ভি আসেন—বসেন একটু—আবার অভ্যর্থনা করল যমুনা আহীর।

আমন্ত্রণটা আর উপেক্ষা করা গেল না। তা ছাড়া পথ চলতে চলতে সেও ভারী ক্লান্তি বোধ করছিল। সারাটা সকাল এক নাগাড়ে কড়া নগ্ন রোদ মাথার ওপর নিয়ে সাইকেল করেছে সে—শরীর যেন বইছিল না। একটু বিশ্রাম পেলে মন্দ হয় না—মনের ভেতর থেকে এই জাতীয় একটা তাগিদ ঠেলে উঠছিল বার বার।

তাকিয়ে দেখল আহীরদের বাথানের দিকে। একজোড়া নিমগাছ এই টিলাটার ওপর ভারী স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়েছে। গাছ দুটো ওরাই লাগিয়েছে সম্ভব—নইলে লাল মাটির এই দেশে এমন করে প্রাকৃতিক খেয়ালে নিমগাছ জন্মায় না। কিন্তু নিজেরাই লাগাক আর মাটির খেয়ালেই হোক্—এই রোদের মাঝখানে তাদের ঠাণ্ডা ছায়া যেন একটা মরূদ্যানের আভাস বয়ে আনে। সেখানে খানদুই দড়ির খাট্‌লি পাতা। ইচ্ছে করল ওই খাট্‌লিদুটোর ওপরে সেও খানিকটা গড়িয়ে নেয়।

খাট্‌লিতে এসে বসল। যমুনা আহীর তাকে বসিয়ে ঘরে ঢুকল, তার একটু পরেই বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস হবে—স্বাস্থ্য আর যৌবন যেন সর্বাঙ্গে প্রখর হয়ে জেগে আছে তার। সুডোল নিখুঁত হাতে মোটা রূপোর বালা, কিন্তু সে বালা অলঙ্কার নয়—অস্ত্র। তার একটি ঘা লাগলে যে কোনো দুর্বিনীত লোভী মানুষের মুখ চোখ ভোঁতা হয়ে যাবে চক্ষের নিমেষে। উজ্জ্বল শ্যাম কান্তি—সারা শরীরে তার রূপ আছে কিনা কে জানে কিন্তু বরেন্দ্র ভূমির জ্বলন্ত রৌদ্র যে বিচ্ছুরিত হয়ে আছে কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

যমুনা আহীরের মেয়ে। ঝুম্‌রি।

চকচকে রূপোর বালা পরা নিটোল হাতে কাঁশার গ্লাস বয়ে এনেছে। রঞ্জনের সামনে ধরে বললে, পীজিয়ে।

—কী এ ?

যমুনা এসে বললে, ওটুকু খেয়ে লিন্ ঠাকুরবাবু। দুধ আছে।

—দুধ! দুধ খাবো ?

হা হা করে হেসে উঠল যমুনা আহীর—মাঠের মধ্য দিয়ে তীর বেগে ছুটে গেল হাসিটা। বললে, দুধ তো পিবারই জন্যে। দেখবার জন্যে না আছেন।

মুক্তা-ধবল দাঁত বের করে হাসল ঝুম্‌রি। নিটোল হাতে গেলাসটি আরো কাছে এগিয়ে এল। আর প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

খাঁটি মহিষের দুধ। মৃদু জ্বাল পড়ে তাতে সঞ্চারিত হয়েছে আরো খানিকটা সুমিষ্ট আস্বাদ। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করল সে। মনে হল, সে শুধু দুধই খেল না, তারও সর্বদেহে যেন 'বরিন্দের' মাঠ থেকে আহরিত হল 'জল-বাতাস-রৌদ্র স্বাস্থ্য';—কোনো পূর্ণ জীবনের একটা তরঙ্গ ভেঙে পড়ল তারও রক্তের গভীরে।

গ্লাসটা ঝুম্‌রিকে ফিরিয়ে দিলে। তারপর তাকালো যমুনা আহীরের দিকে।

—এইবার তোমার কথা শুনব ঘোষ। কী গণ্ডগোলের কথা বলছিলে ?

যমুনা আহীর বললে, হামরা ঘী দহি তৈয়ার করি। সে সব কি বিনা পয়সায় বিকবার জন্য ?

—কে বলেছে বিনা পয়সায় বেচবার জন্য ?

—কে বলবে আবার ?—যমুনার মুখের চেহারাটা বিকট হয়ে উঠল:

জমিদার বলে। পাইক-পেয়াদারা বলে। একদম জেরবার করে দিচ্ছেন ঠাকুরবাবু।

চারদিকে রোদে-ধোয়া বরিন্দের মাঠ। অপরিমিত আলো, অপরিসীম প্রাণ। হু হু করে হাওয়া বইছে। দূরে-কাছে ঘাসবনের মধ্যে পাহাড়ের নীল রেখার মতো পিঠ তুলে জেগে আছে অতিকায় সব মহিষ—বিরাট বিরাট তাদের শিংগুলো রোদে ঝকঝক করছে। ওই শিংগুলো দেখে ভয় করে। আরণ্য-প্রকৃতির শাসনের মতো যেন উদ্যত আর উদ্ধত হয়ে আছে।

সব কিছু মিলিয়ে নিজের মধ্যেও যেন কী একটা সঞ্চিত হতে থাকে। কেমন একটা ধারালো উত্তাপ ইস্পাতের ফলার মতো ঝলকায় রক্তে। আয়নায় নিজেকে দেখতে পাওয়া যায়না, তবু মনে হয় সেই রোদের ছোঁয়ায় অতসী কাচের প্রতিফলকের মতো জলন্ত হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো। মনে হয়, হাতে একটা অস্ত্র থাকলে এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেও নরহত্যা করতে পারে!

রঞ্জন বললে, জমিদার কি জুলুম করে তোমাদের ওপর?

—জমিদার ফের করে হামাদের মাথায় তুলে রাখে?—বিকট মুখে একটা তিক্ত হাসি হাসল যমুনা আহীর: খাজনা যা ল্যায়—সেটা তো দিচ্ছিলাম। কিন্তু পাইক আসবে—পাঁচ হাঁড়ি দই নিয়ে যাবে; কাল পেয়াদা আসবে তো ও ফের পাঁচ সের ঘী নিয়ে যাবে। হামরা তবে কী বিচ্‌রার জন্যে এখানে বাথান করে বসে আছি?

—তোমরা গিয়ে নালিশ করোনা কেন?—প্রশ্নটা নিজের কানেই ব্যঙ্গের মতো শোনালো। তবু জিজ্ঞাসা করলে রঞ্জন। কেমন সংস্কার হয়ে গেছে। দেবতায় বিশ্বাস না থাকলেও ঝুরি-নামা বটগাছের তলায় সিঁদুর মাখানো থান দেখলে যেমন আপনা থেকেই মাথায় হাত

উঠে আসে, তেম্‌নি। ফল হবেনা জেনেও একবার প্রার্থনা-নিবেদন।

—শুধু একবার নালিশ? হাজার বার করেছি।—যমুনা বললে, কী হইল? কিছুই না। উল্‌টে হামাদের হাঁকিয়ে দিলে। বললে, ব্যাটারা ঝুটমুট বলছে।—যমুনা আহীরের মুখের ভেতর দাঁতগুলো ক্রোধে কিড়মিড়িয়ে উঠল: জমিদারবাবুদের অমন হাতীর মতন গতর হয় কেমন করে? এমন মোটা হয় কেন? মুফত্‌ হামাদের দহি-ঘী না খেলে অমন হয় ঠাকুরবাবু?

কেবল দই-ঘিই নয়—ওই মেদস্ফীত স্বাস্থ্যের পেছনে যে অনেক রক্তশোষণের ইতিহাস—একথা রঞ্জনের মনে এল। ভৈরবনারায়ণ আফিং খান আর ঝিমোন। কিন্তু সেই ঝিমুনির ফাঁকে ফাঁকেই তাঁর চোখের দৃষ্টি লোলুপ হয়ে থাকে কোথায় ছোঁ দিয়ে পড়বেন তারই সুযোগে; বরিন্দের মাঠে তালগাছের মাথার ওপরে বসে থাকা ঝিমন্ত শকুন যেন।

দুধের গ্লাস নিয়ে ঝুম্‌রি ভেতরে চলে গিয়েছিল, এতক্ষণ পরে আবার বেরিয়ে এল। হাতে হল্‌দে ন্যাকড়া জড়ানো ধূমায়িত একটা ছোট কল্‌কে। ধোঁয়াটার উগ্র দুর্গন্ধে চারদিকের বাতাস মুহূর্তে আবিল হয়ে উঠল। গাঁজা।

যমুনা আহীর অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ভর্ৎসনাভরা চোখে তাকালো ঝুম্‌রীর দিকে।

—আঃ, এখন কেন নিয়ে এলি! যা—এখন রেখে দে—

রঞ্জন বুঝতে পারল। তাকে দেখে চক্ষুলজ্জা হচ্ছে যমুনার। ঠাকুর-বাবু সাত্ত্বিক লোক—তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেই অভ্যস্ত। তাঁর সামনে গাঁজার কলকেতে টান দিতে সংস্কারে বাধছে।

রঞ্জন অভয় দিয়ে বললে, খাওনা—লজ্জা কি !

অত্যন্ত অপরাধীর মতো হে হে করে সংকুচিত হাসি হাসল যমুনা। বললে, হামরা ছোটলোক ঠাকুরবাবু, একটু নেশা-ভাং না করলে হামাদের চলেনা—

রঞ্জন হাসল : তোমাদের লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই, অনেক বড়লোক আর বাবুলোক তোমাদের চেয়ে নেশায় ঢের বেশি ওস্তাদ।—তার মনে পড়ল মুকুন্দপুরের উকীল তরণীবাবুর কথা। নেশায় তিনি এমনি সিদ্ধকাম হয়েছিলেন যে মদ, আফিং, এমন কি মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌শনে পর্যন্ত তাঁর আমেজ আসত না। অগত্যা সেই আমেজ আনবার জন্যে একটা বিচিত্র প্রক্রিয়া তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ঝাঁপিতে পুরে পুরে তিনি গোখরো সাপ পুষতেন। সাপুড়ের নির্বিষ মুমূর্ষ সাপ নয়—তাজা, হিংস্র, তীব্র বিষধরের দল। যখন শরীরের ভেতরে অবসাদ জমে উঠত, মন্থর হয়ে যেত রক্তের গতি—দাবী করত স্নায়ুতে স্নায়ুতে অস্বাভাবিক খানিকটা উদ্দীপনা, তখন এই গোখরোর ঝাঁপির ভেতরে হাত দিয়ে তাদের একটি ছোবল নিতেন তরণীবাবু। আর সেই বিষে সারাটা দিন তিনি ঝিম মেরে থাকতেন—বিষের উগ্র যন্ত্রণা তাঁর শরীরে সৃষ্টি করতে নেশার একটি স্বর্গীয় আমেজ। রৌদ্রোজ্জ্বল 'বরিন্দের' মাঠের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত মন যেন একটা দার্শনিকতায় ভরে উঠল। শুধু তরণীবাবুই নয়—সারা পৃথিবী জুড়েই চলেছে এই সাপের বিষের নেশা। বিষধরের ছোবল নিয়ে নিয়ে আমেজের মধ্যে তলিয়ে থাকা, এক জাতীয় উন্মাদনায় স্নায়ুকুণ্ডলীকে উত্তেজিত করে তোলা। কুমার ভৈরব-নারায়ণ! আরো অনেক কুমার বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, মিল-মালিক। কিন্তু তারপর? এমন কোনো সাপ নেই কি—যাকে নিয়ে শুধু নেশা-নেশা খেলাই চলেনা? অমোঘ যার বিষ—যে নেশার ঘোর কখনো ভাঙবেনা আর?

আছে বৈ কি। ধানসিঁড়ি ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সিঁথির রেখার মতো পথ। সেই পথে শাদা ধূলোর একটা হাল্‌কা আস্তর বিছানো। রাত্রিতে যখন আকাশে চন্দন মাখিয়ে চাঁদ ওঠে—তখন জ্যোৎস্নায় ধুয়ে-যাওয়া সেই ধূলোভরা ফালি পথের ওপর খেলা করতে বেরিয়ে আসে তারা। পথের ওপর নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে, কিলবিল করে ছুটোছুটি করে, জড়াজড়ি করে পরস্পরের সঙ্গে। অপরিণত ক্ষুদ্র ফণাগুলোকে বাতাসের দিকে সমুদ্যত করে যেন বিষসঞ্চয়ে পুষ্ট করে নিতে চায়। তারপর : তারপর পথের ওপর কোনো দূরাগত পদশব্দের স্পন্দন বাজে—ধানসিঁড়ির কোনো একটা শেষপ্রান্ত থেকে একটি হাল্‌কা ছায়া দীর্ঘায়িত হতে হতে এগিয়ে আসে। চক্ষের পলকে ধানক্ষেতের ভেতরে নেমে মাঠের ফাটলে, অধুনা স্বর্গীয় কোনো কাঁকড়ার বর্ষায় করা গর্তে অথবা বাস্তুহারা কোনো মেঠো ইঁদুরের আস্তানায় মিলিয়ে যায় তারা।

কিন্তু আর কতদিন কেবল ছায়া দেখে ভয় পাবে তারা—আর কতকাল শব্দ শুনে লুকিয়ে যাবে গর্তের আড়ালে ?

ঘোর ভাঙল তার।

যমুনা গাঁজার কল্‌কে নিয়ে টান দিয়েছে, আর সেই সুযোগে এই মানস-মন্থনের পালা শুরু হয়েছে তার। এতক্ষণ পরে কিছু একটা শোনবার প্রত্যাশা করেই যেন সে তাকালো যমুনার মুখের দিকে। খানিকক্ষণ আমেজে বুঁদ হয়ে থাকার পরে যমুনা মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে দিলে। দুর্গন্ধ খানিকটা পিঙ্গল কুয়াশা মাঠের উত্তর হাওয়ায় ভেঙে ভেঙে মিলিয়ে যেতে লাগল।

—আরো একটা জরুরী কথা আছে ঠাকুরবাবু—

কল্‌কেটা নামিয়ে রেখে যমুনা তাকালো। দেখা গেল দুপুরের কড়া

রোদের সঙ্গে গাজার তীব্র নেশার ঝাঁজ মিশে একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছে যমুনার মধ্যে। ক্রমশ লাল হয়ে উঠেছে চোখদুটো—ঠেলে-ওঠা চোখের রক্তবাহী ছোট ছোট শিরাগুলি স্ফীত হয়ে ফেটে পড়বার উপক্রম করছে।

—কী জরুরী কথা?

—আমাদের জেনানাদের লিয়ে কী করব ঠাকুরবাবু?

—কেন, তাদের আবার কী হল?

—নজর লাগছে।—চিবিয়ে চিবিয়ে বললে যমুনা আহীর।

হঠাৎ যমুনাকে কেমন ভয়ঙ্কর মনে হল। তার বাথানের মহিষগুলোর মতোই কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড শরীর—ন্যাড়া মাথা, দৃষ্টিতে একটা কিন্তু জিঘাংসা:

—সে কী, কার আবার নজর লাগল?

—যার নজর লাগে!—যমুনা এমন তীব্র ভয়ঙ্কর ভাবে রঞ্জনের দিকে তাকালো যে মনে হল বুঝি তারই মধ্যে যমুনা আহীর তার উদ্দিষ্ট সেই প্রতিপক্ষকে দেখতে পাচ্ছে। লোকটার ভ্রূরেখা প্রায় নেই বলেই চলে, আর অনেকটা সেই কারণেই হয়তো স্বাভাবিক মানবিকতা হারিয়েছে তার চোখ থেকে। কোনো বুনো জানোয়ার বুঝি থাবা পেতে বসেছে রঞ্জনের কাছে। একটা দুর্গন্ধ বিষাক্ত উত্তাপের মতো ছোঁয়া দিচ্ছে তার গায়ে: ওই শালা পেয়াদার দল। খালি কি দহী-ঘী লিতে আসে? শালাদের মতলব বহুৎ 'বুরা'—ঠাকুরবাবু।

—বটে!

—হামাদের জরু বেটীর দিকে বহুৎ খারাপ নজর দেয়। খারাপ বাতচিত করে। এতদিন সয়ে গেলাম হামরা।—যমুনার চোখ আদিম হয়ে উঠল: সেদিন মাঠের মধ্যে ঝুমরীর হাত ধরেছিল। ঝুমরি হাতের বালার এক ঘা দিয়ে শালার মুখ ফাটিয়ে পালিয়ে এসেছে।—হঠাৎ ক্রোধে

রোঁয়া ফোলানো 'ভামের' মতো সোজা হয়ে উঠে বসল যমুনা আহীর : হামি থাক্‌লে কেবল মুখ ফাটিয়েই পালাতে পারত না—জান ভি মাঠের মধ্যে রেখে যেতে হত।

অভিভাবকের একটা বিজ্ঞ ভঙ্গি নিয়ে রঞ্জন বললে, ছিঃ ছিঃ, ওসব খুন খারাপির কথা ভাবতে নেই।

—হামরা ভাবিনা বাবু—এবার আর ঠাকুরবাবু বললে না যমুনা। ক্রোধে-ক্ষোভে ওই জমিদার বাড়ি সংক্রান্ত মানুষগুলি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আত্মীয়তার অনুভূতিও তার মনে জেগে নেই আর। গাঁজার কলকেটাকে উবুড় করে ঢেলে দিতে দিতে যমুনা বললে, হামরা ভাবিনা। কিন্তু খুন চড়ে যায়। দহি-ঘী বিনা পয়সায় লিয়ে যায় —লেও বাবা। ফের ইজ্জতে হাত দিতে চায়?—যমুনা ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে চোখ ছড়িয়ে দিয়ে বোধ করি জমিদার বাড়িটাকে একবার দেখে নিতে চাইল : হামরা জাতে আহীর বাবু। হামাদের বাপ্‌ঠাকুর্দা ছিল জোয়ান —ছিল ডাকু। - কথায় কথায় জান লিত তারা।

তারা নিত, তাদের বংশধরেরাও আজ নিতে পারে—যমুনার শরীরে যেন এই সত্যটিই ব্যক্ত হয়ে উঠল। রঞ্জন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার মনের মধ্যে জিনিসটা গোপন পাপের মতো বিঁধছে—সে কুমার ভৈরবনারায়ণের অন্নপুষ্ট। তাই যমুনা তাকে মেনে নিতে পারছে না কোনো আত্মীয়তার অন্তরঙ্গতায়; খানিকটা পরিমাণে কাছে এসেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ করে নামতে পারেনি তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমির ওপরে। এমনি এক একটা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত মুহূর্তে নিজেকে কেমন ত্রিশঙ্কুর মতো মনে হয় তার। শূন্য আকাশে যে বেশিক্ষণ আর ঝুলে থাকতে পারবেনা তা সে জানে। কিন্তু নীচে পা দিয়ে দাঁড়ানোর মতো মাটিও কি সে খুঁজে পেয়েছে?

রঞ্জন উঠে পড়ল। বললে, আজ চলি যমুনা, আর একদিন আসব।

—কিন্তু হামরা কী করব বাবু?

যমুনা জানতে চাইল। রঞ্জন ঠিক উত্তর দিতে পারল না। মনে হল, প্রশ্ন করবার আগেই যেন যমুনা নিজের ভেতরেই কর্তব্যটাকে নিশ্চয় করে নিয়েছে।

—যা ভালো মনে হয় তাই কোরো—

এর বেশি আর কী বলা যায়? ধানসিঁড়ি ক্ষেতের আল্‌পথে বিষ সঞ্চয় করে ফিরছে নাগশিশুরা। তাদের বিষফণাকে কে রোধ করবে? কোনো উপদেশ—কোনো সদিচ্ছাকে মনে হবে গুণ্ডামির মতো—স্বার্থপর প্রবঞ্চনার মতো।

—আচ্ছা চলি—

রঞ্জন বেরিয়ে পড়ল। একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে যমুনার মেয়ে ঝুমরি। নাগিনী।

··রঞ্জনের চমক ভাঙল। কত রাত হয়ে গেছে। ঘুমন্ত জমিদার-বাড়ি—নাগরা জুতোর মচ্‌মচানিও শোনা যাচ্ছে না আর। প্রেত পিতৃ-পুরুষেরা কোথায় রক্ত শুষে বেড়াচ্ছে কে জানে! জটাধর সিংহের খুন কি হিসেব নিকেশের প্রথম অঙ্কপাত!

না, আর নয়। শুয়ে পড়া যাক এবার।

পাঁচ

একটা মস্ত গড়খাই—প্রায় বুজে এসেছে। কলমীবন আছে, মাঝে মাঝে এক একটা ঢোঁড়া সাপ ডুব-সাঁতার কাটে শ্যাওলা ভরা কালো জলের তলায়। গলা উঁচু করে ঘোরে পানকৌড়ি—দূর থেকে কেউটের ফণার মতো দেখায়। পানও নেই, কড়িও নেই—গোটা কতক গেঁড়ি-গুগ্‌লি আর এক-আধটা পদ্ম চাকাই ভরসা।

গড়খাই পেরিয়ে একটা উঁচু মিনারের ধ্বংস স্তূপ। লোকে বলে 'বুরুজ'। 'পাল বুরুজ'। হয়ত অবজারভেটরী ছিল পালরাজাদের আমলে। হয়তো এর সমুচ্চ চূড়োয় দাঁড়িয়েই দ্বিতীয় মহীপাল দেখেছিলেন—দিব্যোকের বিদ্রোহী বাহিনীর মশাল রক্ত-জবার মতো ফুটে উঠছে কালান্তক অন্ধকারে।

পাল-বুরুজ ছাড়িয়ে কিছু কাঁটা বন, লাটার ঝোপ। তলায় তলায় বিকীর্ণ ইঁট-পাথরের কঙ্কাল। বিধ্বস্ত প্রাসাদের অস্থি-শেষ। নক্‌সা-কাটা ইঁট, খোদাইকরা গ্র্যানাইট আর কষ্টি পাথরের টুকরো। তার-পরে আবার গড়খাইয়ের বৃত্তাকার রেখা। সেইটুকু পেরিয়ে বুনো ওল আর ঘেঁটু ফুলের একরাশ জঙ্গল ভাঙলে পালনগর শুরু।

নামেই পালনগর, কিন্তু পালেরা কেউ নেই। দেড়শো ঘর পরাক্রান্ত পাঠানের বাস এখানে। উচ্চারণ করে "পায়ঠান"—'ঠ' এর ওপর অস্বাভাবিক জোর দেয় একটা। হয়তো ওই জোরটুকু দিয়েই সেদিনের বীরত্বের জের টানতে চায় একটুখানি।

এই 'পায়ঠান'দের নেতা ফতেশা পাঠান। কালো কুচকুচে জোয়ান শরীর। মুখে পুরু গোঁফ, তার দুটি প্রান্ত দংশনোদ্যত কাঁকড়া-বিছের মতো উর্ধ্বগামী। প্রসন্ন থাকলে সেই প্রান্ত দুটিকে তিনি পাকাতে

থাকেন—উত্তেজনার কারণ ঘটলে টেনে টেনে লম্বা করে যান। দাঙ্গা হাঙ্গামা কাজিয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহ। তিন চারটে দেওয়ানী লড়ছেন কুমার ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে—ফৌজদারীও আছে। 'বাদিয়া মুসলমান' নামে এক শ্রেণীর দুর্দান্ত লোককে এনে বসিয়েছেন 'পাল বুরুজে'র উত্তরে এক খণ্ড পতিত জমিতে। নাম মাত্র খাজনা দেয়—লাঠি ধরে দাঙ্গা হাঙ্গামার সময়। হাত খুব পরিষ্কার 'বাদিয়া'দের। হাঁসুয়ার কোপে এত সহজে মাথা নামিয়ে দেয় যে মুণ্ডুহীন মানুষটা টেরও পায় না কখন সে নিঃশব্দে মরে গেল।

পালনগরের মাঝখানে বেশ বড় আকারের একটি মসজিদ। লাল গাম্বুজটা চোখে পড়ে অনেক দূর থেকে। সারাদিন তার ওপরে জালালী কবুতর চক্র দিয়ে ওড়ে। মিনারের গায়ে দলে দলে বাদুড় ঝুলে থাকে। অনেক কালের পুরোনো মস্‌জিদ। যে পাঠান ফকির গাজী হয়ে পালনগর দখল করেছিলেন, তাঁরই কীর্তি নাকি ওটা।

সমৃদ্ধ পাঠানদের গ্রাম এই 'পালনগরে' শতকরা নিরানব্বুই জন মুসলমান। এতকাল ছোট একটি মাদ্রাসায় 'আলেপ বে-পে' ছাড়া আর কোনো শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না। ফতে শা পাঠান গত বছর একটি এম-ই ইস্কুল করেছেন এখানে। পাঁচ সাতজন মাস্টার এসেছেন গ্রামে—সেই সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর আলোও এসেছে।

ফতেশা পাঠানের বৈঠকখানা ঘরে মজলিশ বসেছিল। রবিবারের সকাল—ইস্কুল ছুটি। ফতেশা স্বয়ং আছেন, একজন মাস্টারও এসে জুটেছেন। তা ছাড়া দৈনন্দিন আগন্তুক জনকয়েক মাতব্বর ব্যক্তি তো আছেনই।

সামনে একখানা খবরের কাগজ। তাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা দানা বেঁধে উঠেছে।

কথা বলছিলেন আলিমুদ্দিন। পাবনা জেলার লোক—আই-এ পাশ করে নানা জায়গা ঘুরবার পর ইস্কুলের মাস্টারী নিয়ে এসেছেন।

আলিমুদ্দিন বললেন, এ বড় আফসোসের কথা, এখনো পাকিস্তান বোঝেননা আপনারা।

এন্তাজ আলী পাঠান, কারবারী লোক। বয়স্ক ব্যক্তি। হাট-বাজারের উপলক্ষে নানা জায়গায় যেতে হয় তাঁকে, ব্যবসায় উপলক্ষে নানা স্তরের লোকের সঙ্গে মেশামেশিও আছে। সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষ। মৃদু হেসে বললেন, বুঝবনা কেন! নানা রকম কথাই তো শুনছি। শহরে দেখলাম ছোকরারা এরই মধ্যে বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আপনি একটু খোল্‌সা করে বলুন দেখি মাস্টার সাহেব।

আলিমুদ্দিন নড়ে চড়ে বসলেন: আসল কথা, আমরা আর ওদের সঙ্গে থাকব না।

—কাদের সঙ্গে?—এন্তাজ আলী প্রশ্ন করলেন।

—কাদের আবার? কাফেরদের।

—হিন্দুদের বলুন।—এন্তাজ আলী শুধরে দিলেন।

—ও একই কথা—আলিমুদ্দিন ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বক্র দৃষ্টি এন্তাজ আলীর মুখের ওপর ফেলে বললেন, কাফের আর হিঁদুতে কোনো তফাৎ নেই। তারা পুতুল পূজো করে, হাজার কুসংস্কার মানে, এক জাত এক জাতকে ছুঁলে তাদের নাইতে হয়। তা ছাড়া তারা ইস্‌লামের শত্রু। কাফের কথার আর কী মানে থাকতে পারে এ ছাড়া!

একটা মস্ত তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়া খাচ্ছিলেন ফতেশা পাঠান। চোখদুটো বোজাই ছিল, আলোচনা শুনছিলেন খুব মন দিয়ে। নলটা ছেড়ে দিয়ে চোখ মেলে তাকালেন এবার। সোজা হয়ে উঠে বসলেন

খানিকটা—দংশনোদ্যত বিছের লেজের মতো গোঁফটাকে টেনে টেনে খানিকটা লম্বা করতে চাইলেন, তারপর :

—যা বলেছেন। ও সব ব্যাটাই হারামখোর। সবাই কাফের। আর সব চাইতে বড় কাফের হল হিজলবনীর ওই ভৈরবনারায়ণ।

এন্তাজ আলী সম্পর্কে ফতেশার চাচা, সেদিক থেকে খানিকটা দুঃসাহস তাঁর আছে। তেমনি হাসিমুখেই বললেন, তোমার সঙ্গে মামলা চলছে বলেই বুঝি ?

—না চাচা, আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনারা সেকেলে লোক, বুঝবেনও না এসব। মাস্টার সাহেবই খাঁটি কথা বলছেন।

বেশ বলুন, শোনা যাক।—এন্তাজ আলী দেওয়ালে গা এলিয়ে দিলেন।

আলিমুদ্দিন অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

—এসব বাজে তর্কের কথা নয়—যুক্তির জিনিস। আমি আরো স্পষ্ট করে বলছি। হিন্দুদের সঙ্গে আলাদা হয়ে নয়া রাষ্ট্র আর নতুন তমদ্দুন তৈরী না করতে পারলে আমাদের কোনো আশা নেই।

—সেদিন এক মৌলবী সাহেব মস্‌জিদে 'ওয়াজ' করে গেলেন। তিনিও ওসব বললেন বটে—

ফতেশা পাঠান নিজের সুচিন্তিত মন্তব্য জুড়ে দিলেন।

—ওসব মৌলবী-টৌলবীর কথা ছেড়ে দিন।—আলিমুদ্দিন বিরক্ত হয়ে উঠলেন : কিছু বোঝে না, এটা বলতে ওটা বলে—সব মাটি করে দেয়। ধর্ম ছাড়া মাথায় কিছু ঢোকে না। ধর্মের নিন্দা আমি করছি না, কিন্তু এ হল রাজনীতির ব্যাপার। এখনো যদি আপনারা হুঁশিয়ার না হন, তা হলে আপনাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

—কে সর্বনাশ করবে, হিন্দুরা ?—এন্তাজ আলী বললেন, কেন, মুসলমানের কব্জীর জোর কি একেবারে মরে গেছে ?

—ভুল হল চাচা সাহেব। কব্জীর জোরের দরকার আছে, কিন্তু একালে তাই সব নয়। রাজনীতির খেলায় হার হয়ে গেলে কোনো কব্জী আপনাদের বাঁচাতে পারবে না। আর এই বেলাই কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

—কংগ্রেস? কেন কংগ্রেস কী দোষ করল? শুনছি, এতকাল তো কংগ্রেস আজাদীর জন্যেই লড়াই করে আসছে। সে তো হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আজাদী—এন্তাজ আলী আস্তে আস্তে বললেন।

—হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আজাদী!—আলিমুদ্দিনের মুখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠল: গোড়াতে 'কায়েদে আজমও' তাই ভাবতেন। এমন দিন ছিল যেদিন গান্ধীজীর ডান হাত ছিলেন জিন্না সাহেব। কিন্তু যেদিন প্রথম তিনি মুসলমানদের স্বার্থের কথা ভাবতে চাইলেন, সেদিন থেকেই তাঁর বরাতে জুটতে লাগল ঘৃণা, সন্দেহ, নিন্দা। গোড়াতে তিনিও মুসলিম লীগকে ভালো চোখে দেখেন নি, কিন্তু পরে বুঝলেন—মুসলমানের খাঁটি বন্ধু যদি কেউ থাকে তবে তা কংগ্রেস নয়, ওই মুসলিম লীগ।

—কিন্তু কংগ্রেস—

—চাচা সাহেব, এতকাল ধরে ওদের একটানা প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা শুনতে শুনতে কংগ্রেস ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না!—আলিমুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: আজাদী! কংগ্রেস কোন্ আজাদীর জন্যে লড়াই করে এসেছে এতকাল? হিন্দুর। আমরা পৌত্তলিকতা মানিনা, তবু কেন আমাদের উচ্চারণ করতে হবে, 'বন্দেমাতরম্'—মাটিকে মা বলব আমরা কোন্ লজ্জায়? কেন আমরা ভাবতে যাব: 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী?' বিপ্লবীদের আমি শ্রদ্ধা করি; দেশের জন্য যারা শহীদ হয়েছে, তাদের সালাম করি আমি। কিন্তু কেন বিপ্লবীদের দীক্ষা নেবার সময়

কালীমায়ের পায়ে প্রণাম করতে হবে? কেনই বা শপথ নিতে হবে ওই পুতুলের খাঁড়া মাথায় ঠেকিয়ে?

ফতেশা পাঠান কী বুঝলেন কে জানে। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেললেন, সাবাস!

আলিমুদ্দিন সরদার একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেললেন তাঁর দিকে। তারপর এন্তাজ আলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, চাচা সাহেব, ওটা মুসলমানের আজাদীর রাস্তা নয়!

—কিন্তু আজাদী এলে হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই কি তাতে সুরাহা হত না?

—না, একেবারেই না।—জোরের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে ফরাসে একটা ছোট কিল বসালেন আলিমুদ্দিন: ইংরেজ দেশ ছাড়বে এটা ঠিক। তার আর বেশিদিন বাদশাহী চলবে না সে তা বুঝতে পেরেছে। একথাও মানি যে তাকে তাড়ানোর পেছনে হিন্দু আর কংগ্রেসেরও অনেকখানি দান আছে। কিন্তু স্বাধীনতা যখন আসবে সে হবে ত্রিশ কোটি হিন্দুর স্বাধীনতা—দশ কোটি মুসলমানেরও না—কয়েক লাখ শিখেরও নয়। চাকরী-বাকরী, সুযোগ-সুবিধা সব জুটবে হিন্দুর ভাগে, মুসলমান পাতের কাঁটাটিও পাবে না।

—এখন অবিশ্যি মুসলমানদের কিছু চাকরী-বাকরীর সুবিধে হচ্ছে—ফতেশা অনেকক্ষণ ধরে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিলেন, ফাঁক পেয়ে এইবারে জুড়ে দিলেন কথাটা: নবীপুরের আলতাফ মিঞা এবারে এম, এল-এ হয়েছে, বিস্তর চাকরী জুটিয়ে দিচ্ছে লোককে।

—লীগ মিনিস্ট্রি রয়েছে যে। হিন্দু মন্ত্রী থাকলে হত নাকি ওসব?

—আজাদী হলেও তো লীগ মিনিস্ট্রি হতে পারে—বলতে চাইলেন এন্তাজ আলী।

—কাঁচা কথা বললেন চাচাসাহেব, একেবারে কাঁচা কথা। আপনার মতো প্রবীণ লোকের কাছ থেকে এ কথা শুনব আশা করিনি। লীগ মিনিস্ট্রি হবে কোত্থেকে? ভোট পাবেন কেমন করে? তিনগুণ বেশি ভোটে হিন্দুরা গিয়ে বসবে গদীতে—আস্‌বে জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট। একটা কথা বলবার মুখ থাকবে না আমাদের।

—কিন্তু যে সব জায়গায় মুসলমান বেশি, সেখানে তো আমরাই জিতব।

—এইবার পথে এসেছেন—আলিমুদ্দিন হাসলেন: খানিকটা বুঝতে পারছেন আমার কথাটা। কিন্তু দুটো একটা প্রভিন্সে মুস্‌লিম মেজরিটি নিয়ে আমরা যুঝব কী করে দেশজোড়া হিন্দুদের সঙ্গে। তাই যেখানে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, সেই সব প্রদেশ নিয়ে আমাদের নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠবে—সে রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান!—আলিমুদ্দিনের গলার স্বর ক্রমশ উচ্ছ্বাসে গভীর হয়ে উঠতে লাগল: আমাদের হাত থেকেই ইংরেজ হিন্দুস্থান কেড়ে নিয়েছিল, যদি এ রাজ্য ফিরে পাওয়া যায় তা হলে এর সবটাই আমাদের পাওনা! কিন্তু নানা অসুবিধের কথা ভেবে সে দাবী আমরা তুলিনি। আমরা শুধু আমাদের মেজরিটি প্রভিন্স নিয়েই নয়া রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই। তাও কি কম হবে! দশ কোটির মধ্যে অন্তত আট কোটি মুসলমানকে আমরা পাবই। আর তা হবে পৃথিবীর বৃহত্তম ইস্‌লামিক রাষ্ট্র। শুধু ইস্‌লামিক রাষ্ট্রই বা বলছি কেন—ইয়োরোপের কটা দেশে আট কোটি লোক আছে? যে আরবেরা একদিন সারা দুনিয়ার ওপর তলোয়ার ঘুরিয়েছিল, কত ছিল তাদের সংখ্যা?

ফতে শা আরামে গোঁফের প্রান্ত দুটো পাকাতে লাগলেন: বেশক্‌!

এস্তাজ আলী চুপ করে রইলেন। চিন্তার রেখা ফুটেছে সারা মুখে: আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—কিচ্ছু শক্ত নয় বোঝা। শুধু বোঝবার মতো মনটাই তৈরী হয় নি চাচাসাহেব! কিন্তু দিন আসছে, আপনারাও আর ঘুমিয়ে থাকতে পারবেন না।

—আপনারা কিন্তু স্বপ্ন দেখছেন—এন্তাজ আলী বললেন।

—স্বপ্নকে আমরা সত্য করে তুলব। মহম্মদ ঘোরী, বক্তিয়ার খিলিজীও তাই করেছিলেন।—আলিমুদ্দিন মাস্টারের চোখমুখ জ্বলতে লাগল: এই স্বপ্নই একদিন আরব থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল।

—কিন্তু একসঙ্গে কি থাকা যেত না?

—না।—আলিমুদ্দিনের স্বর দৃঢ় হয়ে উঠল: সে কথা 'কায়েদে আজম' ভেবেছিলেন, আমাদের পাকিস্তানের মহাকবি ইক্‌বালও তাই ভেবেছিলেন। একদিন তিনি লিখেছিলেন:

"সারে জাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামারা!
আব রোদ্‌ এ গঙ্গা বহ্‌ দিন হ্যায় তুঝকো,
উতরো তেরী কিনারোঁ মেঁ কারোয়াঁ হামারা।"

তারপর তাঁর ভুল ভাঙল। বুঝলেন, হিন্দুস্থান তাঁর কেউ নয়, গঙ্গার জলের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই তাঁর। তিনি বললেন, আমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছিল, তাই ও কবিতা আমি লিখেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি, পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানের কোনো গতি নেই। তাই ভুল শুধরে তাঁকে লিখতে হল:

"অয়্‌ গুল্‌সিতান্‌ এ উন্দুলুস্‌ বহ্‌ দিন হ্যায় য়াদ তুঝকো,
থা তেরী ডালীওঁ মেঁ জব আশিয়াঁ হামারা।
মগ্‌রিব কী বাদীওঁ মেঁ গুন্‌জী আজাঁ হামারী—
সারে জাঁহা সে আচ্ছা, পাকিস্তান হামারা!"

দরদ ভরা গলায়, উচ্চকিত আবৃত্তি করে গেলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার। চমৎকার আবৃত্তি করেন—স্বরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত মুগ্ধতা। উর্দু কবিতার ললিত-ছন্দ-বিন্যাসে কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটা আবিষ্ট হয়ে রইল।

খানিক পরে নীরবতা ভেঙে ফতেশা প্রশ্ন করলেন মানে কী হল ওর?

ধিক্কারের দৃষ্টি ফুটে উঠল আলিমুদ্দিন মাস্টারের চোখে: মুসলমানের ছেলে, এইটুকু উর্দু জানেন না! এটা লজ্জার কথা হল সাহেব!

ফতেশা থতমত খেয়ে গেলেন: কিছু কিছু শিখেছিলাম—তা কবে ভুলে গেছি। আমি তো আপনার মতো আর—

—একটু পড়ে নেবেন আবার। শেখা দরকার।—আলিমুদ্দিন খবরের কাগজটা ভাঁজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন: আমি এবার উঠি—অনেক বেলা হল।

—কিন্তু আলোচনা তো শেষ হল না—এন্তাজ বললেন।

—না, সবে শুরু হল—এবার আলিমুদ্দিনও হাসলেন: আরো অনেক কথা বলতে হবে, আরো অনেক আলোচনা করতে হবে। ভালো কথা, আপনারা সবাই লীগের মেম্বার তো?

এক এন্তাজ আলী ছাড়া সবাই মাথা নিচু করলেন।

—আমি জানতাম—আলিমুদ্দিনের স্বরে অনুকম্পা ফুটে বেরুল: আচ্ছা, কাল আমি চাঁদার খাতা নিয়ে আসব। পাঁচশো পাঠানের গ্রাম এই পালনগরে লীগের শক্ত ঘাঁটি তৈরী করতে হবে একটা। আচ্ছা, চলি এবারে, আদাব।

—আদাব।

আলিমুদ্দিন মাস্টার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বেলা বেড়ে উঠছে। অল্প অল্প হাওয়ায় গুঁড়ো চন্দনের মতো লাল মাটি উড়ছে দিকে দিকে। মিনারের মাথায় ঝুলন্ত বাদুড়গুলোর

পেছনে একদল কাক লেগেছে, বাদুড়ের আর্ত চীৎকার ছড়িয়ে যাচ্ছে বিকৃত যন্ত্রণায়। একরাশ ধূলো আর কুটো-কাটি বয়ে একটা ঘুর্ণি পাক খেতে খেতে উঠে গেল।

বর্ষার জল শুকিয়ে আসা মাটি থেকে কেমন একটা গন্ধ—একটা উত্তপ্ত গন্ধ। পাড়াগাঁয়ের লোক আলিমুদ্দিন মাস্টার—ওই গন্ধটা তাঁর চেনা। ওর কেমন একটা নেশা আছে—একটা মাদকতা আছে যেন। মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে, ওই সামনের ঘূর্ণিটার মতোই চিন্তা-গুলোকে আবর্তিত করে তোলে। আলিমুদ্দিন মাস্টার ভাবতে ভাবতে পথ চললেন।

'সারে জাঁহা সে আচ্ছা পাকিস্তান হামারা।' নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, নির্ভুল বিশ্বাস। এর আর ব্যতিক্রম নেই কোথাও। দৃষ্টি চলে গেল 'পাল-বুরুজে'র উইঢিবি ঘেরা উঁচু চূড়োটার দিকে। এই গড়ের হিন্দু রাজত্ব যেমন একদিন বিজয়ী মুসলমানের শাণিতাগ্র তলোয়ারে পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়েছিল—সেইদিন আবার ফিরে আসছে নতুন করে। 'পাকিস্তান হামারা!'

কোনো সন্ধি? না। কোনো রফা? অসম্ভব। কোনো ঐক্য? অবাস্তব।

কিন্তু এমন কি চিরদিন ছিল? চিরকালই কি এমন চরমপন্থী ছিলেন তিনি?

না, তা নয়। জীবনে তিনিও অনেক করেছেন, অনেক অভিজ্ঞতা তাঁরও হয়েছে। প্রথম প্রথম যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন কতগুলো ঘটনামাত্র মনে হয়েছিল, আজ তারা ধরা দিয়েছে একটা বিশেষ তাৎপর্য্যের ভেতরে—আজ আর কিছু জানতে বাকী নেই তাঁর।

মনে আছে, হিন্দুদের ইস্কুলে প্রথম ভর্তি হওয়ার কথা। যে বেঞ্চে

তিনি বসেছিলেন, সেখানকার তিন চারটি হিন্দু ছেলে খানিকবাদে এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল।

ক্লাশে পড়াচ্ছিলেন বাংলার মাস্টার সারদাবাবু। ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই, কী হচ্ছে?

—বসতে পারছি না।

—কেন?

—ও যে মুসলমান স্যার!

—মুসলমান তো হয়েছে কী?—সারদাবাবুর দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠেছিল।

একজন বলেছিল, ওর গায়ে বিশ্রী রসুনের গন্ধ স্যার। একেবারে মুসলমানী গন্ধ।

হো—হো করে ক্লাশ শুদ্ধ হাসির বন্যায় ভেঙে পড়েছিল। সে হাসি থেকে সারদাবাবুও বাদ যাননি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য—ক্লাশের মুসলমান ছেলেরাও সে হাসিতে যোগ দিয়েছিল।

সারদাবাবু কৃত্রিম ক্রোধে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, যত সব বানরের দল! যা—যা, সামনের ওই বেঞ্চিটাতে বোস গিয়ে।

সেদিন সারা ক্লাশে আর মাথা তুলতে পারেনি আলিমুদ্দিন। কিশোরের প্রথম চেতনায় সে অপমান বিঁধেছিল যেন আগুনের চাবুকে কণ্টকিত আঘাতের মতো। সেই কৈশোরেই মনে হয়েছিল, এ অপমানের জবাব একদিন তাঁকে দিতেই হবে।

তারপরে এ জাতীয় তিক্ত অভিজ্ঞতা বহুবার তাঁর হয়েছে। আঘাতের পর আঘাত এসেছে নানাদিক থেকে—স্পর্শাতুর মন বিদ্রোহ করে উঠেছে বার বার। আরো বড় হয়ে একজন বিদেশী রাজনৈতিক নেতার জীবন-চরিত থেকে তাঁর মনের সমর্থন মিলেছিল:

"নতুন একটি পরিষ্কার কোট পরিয়া আমি স্কুলে আসিয়াছিলাম। হঠাৎ কোথা হইতে মলিন-বস্ত্র পরা জীর্ণ-শীর্ণ দেহ কয়েকটি ছাত্র আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া তাহাদের একজন আমার কোটের ওপর খানিকটা থুথু ছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইল। সে ব্যবহারের অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই, আজ তাহা আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া গেছে।"

তিনি বুঝেছিলেন এ বড়লোকের ঐশ্বর্যের প্রতি দরিদ্রের স্বাভাবিক বিদ্বেষ। আর আলিমুদ্দিন বুঝলেন এ শ্রেষ্ঠতার অভিমানে অন্যের আত্মমর্যাদায় নিষ্ঠুর আঘাত। এ আঘাত একদিন সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে—তাঁর মন ঘোষণা করেছিল।

কিন্তু তখনো তাঁর ভুল সম্পূর্ণ কাটেনি। তখনো তিনি ভেবেছিলেন, সে মর্যাদা ফিরে পাবার পথ সকলের ভেতর দিয়েই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে কৈশোরেই জ্বলে উঠেছিল—উনিশশো তিরিশ সালের আন্দোলনে যোগ দিয়ে শেষবার তাঁর ভুল ভাঙল।

আলিমুদ্দিন মাস্টার চলতে চলতে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন একবার।

উনিশ শো তিরিশ সালের সে ধ্বনির সঙ্গে 'আল্লা হো আকবর' জয়ধ্বনিত হয়েছিল আকাশে বাতাসে। তিন রঙা পতাকার সবুজ-সংকেত তাঁকে সেদিন দিয়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সেদিন তিনিও কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন :

"ইসি ঝাণ্ডেকে নীচে নির্‌ভয়,
বোলো ভারত মাতা কী জয়!'

'ভারত মাতা কী জয়!' সেদিন ভারত মাতাকে বন্দনা করতে জিভে জড়তা আসেনি, মনে জাগেনি পৌত্তলিক কুসংস্কারের প্রশ্ন। দেশের মাটিকে খানিকটা নিষ্প্রাণ বস্তুপিণ্ড বলেই মনে হয়নি সেদিন। 'সুজলাং

সুফলাং সুখদাং বরদাং' মাতৃকামূর্তি সেদিন দীপিত ছিল দৃষ্টির সম্মুখে। সে ভারতবর্ষের পূজা-মণ্ডপে এসে অঞ্জলি সাজিয়েছিল: 'হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খৃষ্টানী'—

কিন্তু তারপর? সাবানের ফেনায় গড়া বুদ্বুদ মায়ার মত মিলিয়ে গেল। মনে পড়ছে হিন্দু মেয়েদের স্নিগ্ধ করাঙ্গুলিতে পরিয়ে দেওয়া সেই চন্দনের তিলক। সত্যাগ্রহের পথে নির্ভীক অভিযাত্রীর দল। আনন্দে-উৎসাহে সারা প্রাণ প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই চন্দন-চিহ্নকে সেদিন মনে হয়েছিল গৌরবের জয়টীকা।

মহিষবাথানের নোনা জল দিগন্তে হেলে-পড়া অস্ত চাঁদের আলোয় চিক চিক করে। হু হু করে রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে সে জলে কলরোল ওঠে—মনে হয় মন্ত্রোচ্চার উঠছে: 'মোরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। জ্যোৎস্নাঝকিত কালো ছায়া-ফেলা দীর্ঘকায় তালবীথি সারা রাত মর্মরিত হয়। দূরে আলোর মালা পরে রাত্রির অপ্সরী কলকাতা ঘুমিয়ে থাকে—উৎসব-শেষে রঙ্গমঞ্চে লুটিয়ে পড়া কোনো সালঙ্কারা নর্তকী যেন।

বাতাসে শীত ধরে। তাঁবুর মধ্যে বিনিদ্র চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখা যায়: একটার পর একটা উল্কা ঝরে পড়ছে। বৃশ্চিক রাশি ধীরে ধীরে একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠে ক্রমে পাণ্ডু হতে থাকে। সকাল থেকে আবার সংগ্রাম শুরু। পুলিশ আসবে—লাঠি আসবে, প্রিজন্ ভ্যানের খোলা দরজা অভ্যাগত-বরণের মতো এগিয়ে আসবে হাত বাড়িয়ে।

নিদ্রাহীন চোখে সমস্ত রাত বুকের মধ্যে কী যেন জ্বলতে থাকে। ঠিক জ্বালা নেই—অথচ আশ্চর্য আগ্নেয় অনুভূতি আছে একটা। ঘুম আসে না, তবু স্বপ্ন ভাসতে থাকে। কন্যাকুমারীর প্রান্তরেখা থেকে সমুদ্রের সফেন জলে স্নান সাঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালেন মহাভারতী; সিংহল তাঁর

পায়ের তলায় ফুটে উঠল একটি রক্তকমলের মতো, সিন্ধুশীকরলিপ্ত কেশজাল ছড়িয়ে পড়ল কারাকোরাম-শিবালিক থেকে খাসী-জয়ন্তীর বেণীবন্ধনে চন্দ্রনাথের সীমান্ত অবধি। বামকর প্রসারিত করে তিনি আরব-সমুদ্রের এলিফ্যাণ্টা থেকে প্রার্থনা করে নিলেন ত্রিশীর্ষ মহাকালের বরাভয়, দক্ষিণকরের নীবার-মঞ্জরী ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে দিলে গঙ্গাহ্রদি শ্যামল বাংলার। উন্নত-কিরীটের তুষারশীর্ষে সৌরদীপ্ত স্বর্ণলেখা জ্বলতে লাগল, আকাশ থেকে আরাত্রিকের রাশি রাশি দেবধূপ নেমে এল কুণ্ডলিত মেঘপুঞ্জের মতো।

তারপর ছয়মাস জেল। আরো ভাস্বর হল স্বপ্ন, প্রতিজ্ঞা হল আরো কঠিন। কিন্তু—

মনে পড়ছে কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়ীতে। সঙ্গে ছিলেন আর একজন সহকর্মী—হৃষীকেশবাবু।

নিকুঞ্জবাবুর বাড়ির বাইরের লনে ফুটফুটে একটি ছেলে খেলা করছিল। হৃষীকেশ বললেন, তোমার বাবাকে একটা খবর দাও খোকা, দরকারী কাজে আমরা এসেছি।

ছেলেটি ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিল। তারপরেই শোনা গিয়েছিল তার উৎসাহিত গলার স্বর: মা, মা, একটি ভদ্রলোক আর একটা মুসলমান বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটি ভদ্রলোক আর একটা মুসলমান। পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে ব্যাখ্যা করে সেটা আর বোঝাতে হয়না। অপমানে কানদুটো জ্বালা করে উঠল, শরীরের সমস্ত রক্তকণা মুহূর্তে এসে জমা হল মুখের প্রতিটি রোমকূপে।

হৃষীকেশবাবু অপ্রতিভের মতো হাসলেন। যেন কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে চাইলেন, ছেলেমানুষ।

—না, না, তাতে আর কী হয়েছে! প্রাণপণে কাষ্ঠহাসি হাসতে হল আলিমুদ্দিনকে। মনে পড়ে গেল সারদাবাবুর ক্লাশে সেই অভিজ্ঞতা: ওযে মুসলমান স্যার।

এক আধটা নয়, এমন অনেক খুঁটিনাটি। সর্বশেষ অভিজ্ঞতা হল আরো দিনকতক পরে।

হৃষীকেশবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বটা দানা বেঁধে উঠেছিল একটু একটু করে। ভদ্রলোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী, দেশের জন্যে সব কিছু সমর্পণ করে বসে আছেন। তাঁর মা 'হরিজন পল্লীতে' নাইট-ইস্কুল করেছেন, তাঁর বোন কল্যাণী স্বেচ্ছাসেবিকাদের নেত্রী।

আলি দা' বলে ডাকত কল্যাণী। নিজের বোন নেই আলিমুদ্দিনের, বড় ভালো লাগত মেয়েটিকে; আরো ভালো লেগেছিল—যেদিন হৃষীকেশ বাবুর পাশে বসিয়ে তাঁকেও ভাইফোঁটা দিয়েছিল কল্যাণী: 'যমের দুয়োরে দিলাম কাঁটা'—। চোখ ভরে সেদিন তাঁর জল ঘনিয়ে এসেছিল, সেকথা আজও তো স্পষ্ট মনে পড়ে।

স্কুলের সেকেণ্ড্ ক্লাশে পড়ত কল্যাণী। মধ্যে মধ্যে তাকে দু'চারটে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতেন আলিমুদ্দিন। হাতে যেদিন কোনো কাজ থাকত না সেদিন অযাচিতভাবেই এসে বসতেন হৃষীকেশের বৈঠকখানায়, ঘরে কেউ না থাকলেও খবরের কাগজের পাতা উল্টে সময় কেটে যেত। তারপরে হয়তো হৃষীকেশ অথবা কল্যাণী কেউ এ ঘরে এসে তাঁকে আবিষ্কার করত: বাঃ—এই যে, কখন এলেন আপনি?

—এই তো কিছুক্ষণ হল।

—তবু একবার ডাকেননি! আচ্ছা মানুষ তো! এতদিন ধরেও পরের মতো হয়ে রইলেন!

—পরের মতো নই বলেই তো বিনা-নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্তে এসে বসে

আছি। বাইরে থেকে কেউ এসেছি, এটাকে তারস্বরে ঘোষণা করতে চাইনি—হেসে জবাব দিতেন আলিমুদ্দিন।

কিন্তু এই নিঃশব্দে আসাটাই কাল হল তাঁর পরে?

কাল? না—না, সেই হল আশীর্বাদ। সত্যকে চিনলেন তিনি, আবিষ্কার করলেন মুখোসের আবরণে লুকিয়ে থাকা বাস্তবের মুখশ্রীকে। মহিষবাথানের শীতার্ত রাত্রিতে জাগ্রৎ-স্বপ্নে-দেখা আলোকময়ী মহাভারতী-মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল—আকাশ থেকে ঝরে-পড়া এক একটা উল্কাখণ্ডের মতো।

ঝিমঝিম করে সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টি। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছিল পূবদিক থেকে। ভিজতে ভিজতে আলিমুদ্দিন হৃষীকেশবাবুর বৈঠকখানায় এসে উঠলেন। বড় ভালো লাগছে সন্ধ্যাটাকে। কল্যাণীর মায়ের কাছে খিচুড়ি খাওয়ার আবদার করা যেতে পারে, গান শোনবার দাবী করা যেতে পারে কল্যাণীর কাছে।

হৃষীকেশ বৈঠকখানায় নেই। টেবিলে একটা শেজবাতি জ্বলছে। অভ্যাসবশে একটা ইজি-চেয়ারে আরামে এলিয়ে বসলেন আলিমুদ্দিন।

একটা ডাক দিতে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই শব্দটা ভেসে এল। ভেসে এল অলক্ষ্য ব্যাধের স্থির লক্ষ্য একটি শাণিত তীরের মতো। বৃষ্টির ঝিরিঝিরি আর হাওয়ার শন্‌শনানি তাকে প্রতিরোধ করতে পারলনা।

—কী দরকার অত মাখামাখি করার? সবটারই একটা সীমা আছে।

হৃষীকেশের মায়ের গলা। হরিজন পল্লীতে যিনি নাইট-স্কুল করেছেন, নিজের হাতে বোনা সুতোর খদ্দরের শুভ্র শাড়ীতে যাঁকে কখনো কখনো ভুল হয়েছে তপস্বী ভারতবর্ষ মনে করে।

অপরাধিনীর স্বরে জবাব এল কল্যাণীর।

—তোমরাও বড্ড বেশি দোষ ধরছ। কী এমন অন্যায়টা হয়েছে? বাড়িতে নিয়মিত আসেন, এত ভালোবাসেন, দাদা বলে ডাকি—

কল্যাণীর মার স্বর আরো বেশি তীব্র শোনালো। আরো বিষাক্ত।

—ওঃ, একেবারে সাতকেলে দাদা! জাত নয়, গোত্তর নয়—ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি?

চেতনাটা যেন ক্রমশ অভিভূত হয়ে পড়ছে। ফাঁসির দড়িতে অধবারিতভাবে ঝুলে পড়বার পরেও বাঁচবার একটা অন্তিম আক্ষেপের মতো সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করবার চেষ্টা করছেন আলিমুদ্দিন—চেষ্টা করছেন একটা মর্মান্তিক প্রয়াসে। নিশ্বাস বন্ধ করে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—যেন এখুনি শুনতে পাবেন এ আক্রমণের লক্ষ্য তিনি নন।

কিন্তু আত্মবঞ্চনা চললনা বেশিক্ষণ। কল্যাণীর মা নিজেই সে স্বপ্নকে ভেঙে খান্ খান্ করে দিলেন পরমুহূর্তে।

—দিনরাত আলি দা' আর আলি দা'—নাম করে করে মেয়ে 'আমার অজ্ঞান। বেশ তো, দাদা আছে থাক, মাঝে মাঝে আসুক যাক—কিন্তু এ কী! আলি দা' একটা অঙ্ক কষে দিন, আলি দা' একখানা নতুন গান শুনুন—এ সমস্ত কী! ও জাতের সঙ্গে অমন মাখামাখি কিসের!

ও জাত! ছেলেবেলায় সারদাবাবুর ক্লাসের সেই হাসির আওয়াজটা যেন আকাশ ফেটে ভেঙে পড়ল। দু হাতে কান চেপে ধরে উঠে পড়লেন আলিমুদ্দিন। সমুদ্রের অতল জলে যেন ডুবে যাচ্ছেন তিনি, নিশ্বাস নেবার মতো এতটুকু ফাঁকা আকাশ বুঝি কোনোখানে নেই!

যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে পথে নেমে গেলেন। দিকভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত।

চোখে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সম্মুখের সব কিছু লক্ষ্য-বস্তুকে চির-দিনের মতো তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস সাপের লেজের মতো তাঁর চোখে মুখে ঝাপটা মারতে লাগল, সর্বাঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে লাগল নাইট্রিক অ্যাসিডের জ্বালার মতো। অবশেষে নগ্ন পায়ে বুড়ো আঙুলে যখন নুড়ির একটা ঠোকা লাগল, নোখ ফেটে গিয়ে গড়াতে লাগল রক্ত—সেই মুহূর্তে নিজের মধ্যে ফিরে এলেন আলিমুদ্দিন।

: ওর গায়ে বিশ্রী রসুনের গন্ধ।

: একজন ভদ্রলোক, আর একটা মুসলমান।

: ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি?

রক্তাক্ত বুড়ো আঙুলটা চেপে বৃষ্টি-ঝরা আকাশের তলায় পথের কাদার ওপরেই বসে পড়লেন আলিমুদ্দিন। তাঁর ধর্ম জানে, তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা জানে, নিজের বোনের চাইতে আলাদা দৃষ্টিতে কোনোদিন তিনি দেখেননি কল্যাণীকে।

ভালোমন্দ সব সমাজেই আছে। তাঁর নিজের সমাজ পিছিয়ে পড়া, অনেক দোষ ত্রুটিও আছে তার। সে কথা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাই বলে সমাজের প্রতিটি মানুষকে কেন এই ঘৃণার আঘাত!

সেই ভাই ফোঁটার তিলক তো এখনো তাঁর ললাটের স্পর্শানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে আছে। সেই 'যমের দুয়োরে দিলাম কাঁটা'—সে তো তাঁরই প্রতি অকৃপণ মঙ্গল-কামনা। তবে?

কাটা নোখের অসহ্য যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে তীব্রতর যন্ত্রণার মধ্যে তার উত্তর এল। কল্যাণী আছে, তার কল্যাণ-কামনাও আছে। কিন্তু কল্যাণীর সামনে ভ্রাতৃত্বের সত্যিকারের গৌরব নিয়ে দাঁড়াতে জানলেই তার পূর্ণ ফল আসবে তাঁর হাতে।

কিন্তু সে কেমন করে? কী উপায়ে?

মাথা তুলে দাঁড়াও। ছোট হয়ে নয়, ঘৃণার অনুকম্পায় নয়, অনুগ্রহের প্রসাদের মধ্যে দিয়েও নয়। যেদিন তাঁকে ছোট করে দেখবার মতো স্পর্ধাও কারুর থাকবেনা, যেদিন মক্কা থেকে মস্কো পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলা ইস্‌লামী সমশেরের দীপ্তি পড়বে ভারতবর্ষের মুখে—সেইদিন। সেইদিনই কর্ম দেবীর রাখীবন্ধন উৎসব সফল হবে শাহেন্‌শা বাদশা হুমায়ূনের সঙ্গে।

সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনার গতি মোড় ঘুরল। দিন কয়েক সীমাহীন অনিশ্চয়তায় কাটবার পরে পথের নির্দ্দেশ মিলল তাঁর।

—"I am first a Mussalman, then an Indian."—

মৌলানা মহম্মদ আলীর উক্তি। দেশের কাজে সমর্পিত-প্রাণ জন-নায়কের স্বপ্নভঙ্গের স্বীকৃতি।

না, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর তাঁর বিদ্বেষ নেই। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ইংরেজকেই কি তিনি ঘৃণা করেন? না—তা নয়। কিন্তু হিন্দুর যে দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানকে বিচার করে, ইংরেজের যে মনোভাব ভারতবর্ষকে শাসন করে, তারই বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান।

এত বড় হিন্দু সমাজ। নতুন ভারতবর্ষকে গড়েছে, এনে দিয়েছে জাতীয় আন্দোলনের অমর মন্ত্র, আজাদীর শপথ। কেমন করে তিনি ভুলবেন তাঁর সেই অনন্যব্রতী সহকর্মীদের, কেমন করে ভুলবেন তাঁদের কথা—যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুক্তি ঘোষণা করে গেলেন হিন্দু আর মুসলমানের? মহিষবাথান যাত্রার আগে যে বোনেরা কপালে চন্দন চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, যে মায়ের দল ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, যে কল্যাণীর কল্যাণস্পর্শ তাঁর জীবনের একটা অপরূপ সঞ্চয়, তাদের তিনি ঘৃণা করো না। শুধু চান—তাদের কাছে প্রতিদিন পাওয়া এই ঘৃণার

কলঙ্ককে মুছে নিতে, সোজা মাথায়, বলিষ্ঠ পেশল বুকে নিজের পূর্ণ মর্যাদায় দাঁড়াতে। হিন্দু হিন্দুত্বের ধ্বজা বয়ে বেড়াক—মুসলমান কেন ভুলে যাবে তার শেষ নবীন দীপ্ত বাণীকে, ভুলে যাবে তার দিগ্বিজয়ী তলোয়ারকে ?

বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। মিত্রতা হয় সমমর্যাদার ভিত্তিতে। সেই সাম্য—সেই মর্যাদাকে আগে নিতে হবে আদায় করে। আগে করতে হবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। 'পাকিস্তান হামারা'—

পথ চলতে চলতে কি এতক্ষণ দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন আলিমুদ্দিন ? এইবারে চোখ রগড়ালেন। ফতেশা পাঠানের বৈঠক থেকে বেরিয়ে নিজের খেয়ালে হাঁটতে হাঁটতে কতদূরে চলে এসেছেন তিনি! পাল-বুরুজ অনেক পেছনে পড়ে গেছে, তার চূড়োর ওপর উড়ন্ত জালালী কবুতরগুলোকে এতদূর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক এক ঝাঁক প্রজাপতির মতো।

অতীতের রোমন্থন করতে করতে প্রায় এক মাইল পথ পার হয়ে এসেছেন আলিমুদ্দিন। হেঁটে চলেছেন উঁচু নীচু টিলা জমির লাল ধুলো ভরা পথ দিয়ে। বেলা প্রায় মাথার ওপর। মাঠের ভেতর দিয়ে একটা ঘূর্ণি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে, রৌদ্রদগ্ধ সীমান্তের ওপার থেকে কারুর অদৃশ্য হাতছানি দেখতে পাচ্ছে যেন। একটু দূরেই একটা উঁচু ডাঙার ওপর 'কারবালা'। প্রতি বছর পালনগরে মহরম শেষ হলে এই কারবালাতেই তাজিয়া বয়ে আনা হয়।

কারবালার পাশেই 'বাদিয়া'দের ছোট একটি গ্রাম : মুস্তাফাপুর। এই এলাকার মানুষগুলি তাঁর ভারী অনুগত, পালনগরে ফতে শাহুর কাছে দরবার করতে গেলে প্রায়ই তাঁর কাছে সেলাম বাজিয়ে আসে। একটা হোমিওপ্যাথিক বাক্স আছে তাঁর, আর আছে একখানা 'সরল গৃহ-চিকিৎসা'। আপদে-বিপদে, সময়ে অসময়ে কিছু কিছু ওষুধ বিতরণ

করে মুস্তাফাপুরের দুর্বিনীত বাদিয়াদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বলতে গেলে এরাই ফতেশার সামরিক শক্তি—দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় লাঠি, হাঁসুয়া আর বে-আইনি গাদা-বন্দুক নিয়ে এরাই সর্বাগ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে রণক্ষেত্রে। প্রত্যেকের গায়েই দুটো চারটে আঘাতের চিহ্ন আছে, অনেকেরই নাম তোলা আছে থানার দারোগাবাবুর দাগী আসামীর ফিরিস্তিতে। রাতবিরেতে প্রায়ই চৌকীদার এসে হাঁক পাড়ে: করমুদ্দি, ঘরে আছ? ও গণি ভুঁইয়া, তোমার খবর কী?

হোক দাগী, হোক দুরন্ত। তবু ইস্‌লামের এরাই প্রাণশক্তি—মনে মনে প্রত্যাশা রাখেন আলিমুদ্দিন। পাকিস্তানের লড়াইয়ে এরাই আগামী মুহূর্তের জঙ্গী ফৌজ। ইস্‌লামী ঝাণ্ডার এরাই সত্যিকারের উত্তর সাধক।

মুস্তাফাপুরের বস্তিতে ঢুকে পড়লেন আলিমুদ্দিন। এসেছেন যখন, একবার খবর নিয়ে যাওয়া যাক।

বাদিয়াদের বস্তির চেহারা একটু ভিন্ন ধরণের। ক্ষেত-খামার, গাছ-গাছালি নিয়ে এদেশের গৃহস্থ পল্লীর মতো নয়, প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির একখানা আমবাগান কিংবা একটা এঁদো ডোবার ব্যবধান নেই। এরা অদ্ভুতভাবে দলবদ্ধ—যেন নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের এতটুকু সীমারেখা টেনে রাখতে চায় না। সারি সারি চালা ঘর গায়ে-গায়ে সাজানো, মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ চলার পথ। সেই চলার পথটুকুও কখনো একটা খাট্‌লি অথবা দুটো একটা জলচৌকি কিংবা আরো দশটা জিনিসে অবরুদ্ধ। যেন নিজেদের ভেতর দিয়ে কাউকে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে দিতে চায় না—গণ্ডির মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চায়।

—মাস্টার সাহেব যে! আদাব—আদাব।

সম্বর্ধনা এল পাশের একটি ঘরের দাওয়া থেকে। পাকা-দাড়ি এক

বৃদ্ধ জলচৌকির ওপর বসে হুঁকো টানছে। কাঁচা পাকায় মেশানো তার বিশৃঙ্খল চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে ঝুলে পড়েছে তার দুকানের ওপর দিয়ে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং জ্বলন্ত; গা খোলা—হাতের আর কাঁধের পেশীগুলি ভাঙাচুরো অবস্থায় শরীরের নানা জায়গায় শির-স্নায়ুর বাঁধনে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। দেখলেই মনে হয়, শুধু হাওয়াতেই তার বয়েস বাড়েনি, অনেক সমুদ্রের ভেতর দিয়ে পাড়ি জমাতে হয়েছে তাকে।

—আদাব, আদাব। ভালো আছো তো এলাহী?

—জী আছি একরকম। তা এই দুপুরবেলা এদিকে কোথায়? কোনো রোগী আছে নাকি?

—না, রোগী খুঁজতে এলাম।—আলিমুদ্দিন হাসলেন।

—আসুন, আসুন, উঠে বসুন—ইলাহী আহ্বান জানালো: তামুক খান।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দাওয়ায় উঠে বসলেন আলিমুদ্দিন। একটা খাটুলির ওপর বসলেন আরাম করে। এলাহীর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে তাতে মৃদু মন্দ টান দিতে দিতে তাঁর মনে হল, আঃ সত্যিই তিনি বড় ক্লান্ত! সকাল থেকে এখনো কিছু খাওয়া হয়নি, খাওয়ার কথা ভুলেও গিয়েছিলেন। ফতে শাহুর বৈঠকখানায় এস্তাজ চাচার সঙ্গে সেই তর্ক বিতর্ক, উত্তপ্ত মস্তিষ্কে পথে বেরিয়ে আসা। তারপর পথ চলতে চলতে স্মৃতির ওপর থেকে একটার পর একটা আবরণ সরিয়ে দেওয়া। সমস্ত বোধ যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—এখনো বুঝি চান-খাওয়া কিছু হয়নি মাস্টার সাহেবের?—মনের ভাবটা রূপ পেয়ে উঠল এলাহী বক্সের জিজ্ঞাসায়।

—নাঃ—তামাকের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন।

—সে কি কথা! এলাহী শিউরে উঠল: বেলা তিনপহর যে কখন পেরিয়ে গেছে! তা হলে আমার এখানেই:যা হোক কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা করি।

—না-না ওসব কিছু করতে হবেনা—ধীরে ধীরে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন। বললেন, কোনো দরকার নেই ব্যস্ত হবার। একটু বেশি বেলাতেই খাওয়া আমার অভ্যেস।

—তা হোক। একটু চিঁড়ে-মুড়ির জলপান! নতুন গুড় আছে ঘরে—আগ্রহভরে আবার জানতে চাইল এলাহী।

—বলেছি তো কিছু করতে হবেনা—আলিমুদ্দিনের গলার স্বরে এবার যেন বিরক্তিই ফুটে বেরুল। মিনিটখানেক নিঃশব্দে তামাক টেনে জানতে চাইলেন, পাড়ার খবর কী?

—চলছে এক রকম করে!

—এক রকম কেন? ভালো নয়? হুঁকো নামিয়ে জানতে চাইলেন আলিমুদ্দিন।

এর মধ্যে কখন কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেন একটা নিড়ানি হাতে করে এসে দাঁড়িয়েছে নীচের ফালি পথটুকুতে। অযাচিতভাবে সেই-ই একটা ফোড়ন ছেড়ে দিলে কথার মাঝখানে।

—ভালো আমাদের থাকতে দেবে কেন সাহেব! শাহু কি তেমন লোক?

আচমকা যেন একটা ঢিল এসে ছিটকে লাগল আলিমুদ্দিনের কপালে। চমকে তাকিয়ে দেখলেন হোসেনের দিকে। কালো মুখের ভেতর থেকে দু সারি সাদা দাঁত বের করে উজ্জ্বল হাসি হাসছে সে।

—কী সব যা-তা বলছিস বেকুব?—চটে একটা ধমক দিলে এলাহী: শাহু আমাদের ভাত দেয়না? আমরা খাইনা তার নিমক?

—খুন দিয়ে নিমক পাই চাচা। কিন্তু নিমকের চাইতে খুনের দাম বেশি—হোসেনের শাদা শাদা দাঁতে আবার সেই উজ্জ্বল হাসি। হাসিটাকে ভালো লাগলনা আলিমুদ্দিনের

কেমন যেন অনুভব করলেন এ আক্রমণের লক্ষ্য শুধু শাহুই নয়—এর আঘাত তাঁরও ওপরে এসে পড়েছে মুখ লাল করে বললেন, তোমার যে খুব লম্বা চওড়া কথা শুনতে পাচ্ছি!

—না জনাব, লম্বা কথা আমরা বলব কোত্থেকে! আমরা ছোটলোক, আমরা আছি কেবল খুন দেবার বেলায়, জেলে যাবার বেলায় আর উপোস করার বেলায়। লম্বা কথা বললেই বা তা শুনছে কে!

ব্যঙ্গোক্তিটা এবার আরো তীব্র, আঘাতটা তাঁর ওপরে আরো প্রত্যক্ষ। রাগে অপমানে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার—অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাও জোগালো না তাঁর মুখে।

—আদাব মাস্টারসাহেব, চলি—হোসেন আর এক ঝলক শাদা হাসি বিতরণ করে বিদায় নিলে।

—কী আস্পর্ধা! খানিক পরে সংক্ষেপে বলতে পারলেন মাস্টার।

—তা বটে, ভারি অন্যায়। এলাহী বক্স মাথা চুলকোতে লাগল: তবে কিনা নেহাৎ অন্যায় বলেনি। আমরা তো তিনপুরুষ ধরে দেখে আসছি—

—কী বললে! হাতের হুঁকোটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখলেন আলিমুদ্দিন: তোমরাও সবাই মিলে ওই সব ভাবছ বুঝি? মুসলমান হয়ে মতলব আঁটছ নিমকহারামীর?

—তোবা, তোবা।—দু হাতে কানে আঙুল দিলে এলাহী বক্স। জিভ কেটে বললে, জী না—না, ওসব আমরা কখনো বলি না। দুঃখে কষ্টে মানুষের মুখ দিয়ে দুচারটে এটা-ওটা কথা বেরিয়ে পড়ে আর কি!

—এটা-ওটা কথা ? না, না, এটা-ওটা কথাকে তো আদার দেওয়া যায় না—কড়া গলায় আলিমুদ্দিন বললেন। মুখে ছায়া পড়েছে, ঘনিয়েছে মেঘ। শাহুর খাস জঙ্গী জোয়ানদের মধ্যেও একি অতৃপ্তি মাথা তুলেছে আজ! চেতনা জাগুক তা তিনিও চান—কিন্তু তার এ কী রূপ! এ রূপের সম্ভাবনা তাঁর মনে আসেনি, এর পরিণাম কী তাও তাঁর ধারণার বাইরে। হঠাৎ গভীর একটা আশঙ্কা তিনি অনুভব করলেন। রৌদ্রদগ্ধ চৈত্র-দুপুরে আচমকা কোনো 'বাদিয়া'-পল্লীতে আগুন লাগলে আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া দমকা হাওয়া পরম উল্লাসে একটির পর একটি খড়ের চালে সে আগুনকে বয়ে নিয়ে যায়—আধ ঘণ্টার মধ্যে এত বড় পাড়াটায় পড়ে থাকে শুধু রাশীকৃত ছাইয়ের পিণ্ড। তাই একটা ফুলকিও এখানে ভয়াবহ। শাহুকে বলতে হবে ব্যাপারটা।

হঠাৎ ঘরের মধ্য থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল।

চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন: সে কি—অসুখ কার ?

—আজ্ঞে না, ও কিছু না—এলাহী বক্‌স জিনিসটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করল যেন।

কিন্তু আবার সেই গোঙানি। আলিমুদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, লুকোতে চাইছ কেন ? অসুখ কার ?

মাথা নত করে এলাহী বক্‌স বললেন, আমার বড় বেটির। সাকিনার।

—কী অসুখ ?

এলাহী নিরুত্তর রইল।

—অসুখটা কী, তাও বলতে বারণ আছে নাকি ? দরকার হলে আমি তো চিকিৎসা করতে পারি।

—আপনি পারবেন না জনাব।

—পারব না !

—না। ওর সারা গায়ে পারার ঘা বেরিয়েছে।—অসীম লজ্জায় যেন মাটির মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে জবাব দিলে এলাহী বক্‌স।

—পারার ঘা!—শরীর শিউরে উঠল আলিমুদ্দিনের: ছিঃ, ছিঃ, কী করে হল?

—শাহুর বাড়ীতে বাঁদীর কাজ করত—সংক্ষেপে উত্তর এল।

—শাহুর বাড়ীতে!

—জী!—একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালো এলাহী বক্‌স: শাহুকে ডাকত ধর্মবাপ বলে।—নিষ্প্রাণ শীতল কণ্ঠের উত্তর এল।

ঘরের মধ্যে গোঙানি চলছে। দূরে পোড়া মাটির মাঠ। অভুক্ত পেটে ক্ষিদের আগুন জ্বলছে। আলিমুদ্দিন মাস্টারের মনে হল চারদিকের খরধার রোদে কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেনের তীক্ষ্ণ শাণিত হাসিটা যেন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে।

চক্‌মকিতে ঘা না লাগলে কি ঠিকরে পড়ে ফুল্‌কি?

ছয়

রেশমের কুঠিয়াল ক্রু সাহেবের কুঠি এখনো আছে, রেশম নেই।

রেশম নেই, রেশমী সাহেবীয়ানাও নেই। মোটা জিনের আধময়লা স্যুট—গলার টাইটা পর্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে এসেছে। একটা নতুন টাই কেনবার মতো অর্থ-সঙ্গতি এখনো ঘটে ওঠেনি ক্রু সাহেবের। মার্থার যে রঙীন স্কার্টটা সংপ্রতি পেন্‌শন পেয়েছে, তার থেকে একটা ফালি কেটে নিয়ে আত্ম-সম্মান বাঁচানো যায় কিনা সেই চিন্তাতেই মগ্ন ছিল ক্রু সাহেব।

সামনে একটা ঠ্যাং-ছোট টেবিলে ঠাণ্ডা হচ্ছে ছোটা হাজ্‌রী। একটা মুরগীর ডিম, দু টুক্‌রো মার্থার হোম্‌-মেড্‌ নোন্‌তা স্কচ-ব্রেড, দুটি সুপুষ্ট কলা—তাতে দু চারটি আঁঠি থাকা অসম্ভব নয়। আর আছে এক কাপ গৌড়ীয় চা, তার বর্ণ কৃষ্ণাভ। সংপ্রতি চিনি পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে, আখের গুড়েই চায়ের মিষ্টতা সাধন করতে হচ্ছে।

মার্থার ঝাড়নের শব্দ। ক্রু সাহেবের ধ্যানভঙ্গ হল।

পরিষ্কার বাংলা ভাষায় মার্থা বললে, চা খাচ্ছ না যে?

করুণ চোখে কালো চায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল ক্রু সাহেব; তারপর বিনীত কণ্ঠে বললে, বড্ড গন্ধ লাগছে। একটু চিনি হয় না মার্থা?

মার্থা ভ্রূভঙ্গি করে বললে, আমার চিনির দোকান আছে, না কল আছে একটা?

—না, না, তা বলছি না। মানে, যদি কোথাও একটু থাকে টাকে—

—নিজে খাবার জন্যে লুকিয়ে রেখেছি কেমন?—খাঁটি বঙ্গনারীর মতো একটা মুখ ঝাম্‌টা মারল মার্থা: আজ তিন হপ্তা ধরে কত চিনি এনে দিয়েছ—মণ খানেক ঘরে জমা করে রেখেছি।

এতক্ষণে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল ক্রু সাহেবের।

—ছাখো মার্থা ক্যারু, তোমার ভয়ঙ্কর মুখ হয়েছে আজকাল। তুমি ভুলে যাচ্ছ—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই মার্থা ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়েছে।

মার্থা ক্যারু। হ্যাঁ ক্রু সাহেবের আদত নাম ক্যারুই বটে। এ অঞ্চলের লোক গোড়ার দিকে বিকৃতি ঘটিয়ে উচ্চারণ করত কুরু। তার-পরে হয়তো কোনো ইংরিজি-শিক্ষিত ব্যক্তি ভুলটা শুধরে দিয়ে বলেছে, নামটা কুরু হতে পারে না—হবে ক্রু; হয়তো ট্রেণের কোনো ক্রু সাহেব তার মনশ্চক্ষের সামনে ভেসে উঠে থাকবে। সেই থেকেই ক্যারু সাহেব ক্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে গ্রামের লোকে কেউ কেউ এখনো কুরুই বলে।

মার্থার রং-জ্বলে যাওয়া ফিকে গোলাপী গাউনটা যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর একটা বিড়ির সন্ধানে পেণ্টুলুনের পকেটে হাত ঢোকাতে আর একটা নতুন ভয়াবহ সত্যের সন্ধান মিলল। পকেটের নীচেকার সেলাই খুলে গিয়ে কখন একটি বাতায়ন রচিত হয়েছে, আর তার অবারিত পথে বিড়িগুলো কোন মুক্ত দিগন্তের দিকে ডানা মেলেছে।

অগত্যা প্রচণ্ড একটা ক্রুর মুখভঙ্গি করে ক্রু ওরফে ক্যারু গুড়ের চায়ে একটা চুমুক দিলে। একখানা রুটি তুলে নিয়ে একগ্রাসে গিলল সেটাকে। তারপর আধখানা কলার কামড় দিয়ে তার আঁটিগুলোকে জিভের আগায় সংগ্রহ করতে করতে নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেল।

নীল সমুদ্রের সফেন ঢেউয়ের পর ঢেউ পেরিয়ে টেম্‌স নদীর মোহানা।

দূরে ছবির মতো আঁকা টাওয়ার অব্ লণ্ডন। গোল্ডার্স গ্রীণ-এ ঝকঝকে তকতকে একখানা বিশাল বাড়ি: ক্যারুজ। ইণ্ডিয়ান সিল্কস্ অ্যাণ্ড ফেবরিক্স্।

কিন্তু ঢেঁকি কি কখনো স্বর্গে যায়? রাশি রাশি শুকনো পাতা, মরা পলু পোকা আর ভাঙা তাঁতের সঙ্গে কবে ভারতবর্ষের নরম মাটির স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে প্যার্সিভ্যাল্ ক্যারুর। এতদিনে বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে। আর যদি বেঁচেও থাকে—সেখানকার সংসারে, সেখানকার সমাজের পরিবেশে স্মাইদ্ ক্যারু—অর্থাৎ ক্রু সাহেবের স্থান কোথায়?

—রাস্কেল্! ওল্ড্ ফুল!

স্বল্পার্জিত ইংরেজি বিদ্যা নিয়ে বাপের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করল ক্রু সাহেব।

রেশমের কুঠি করেছিল পার্সিভ্যাল—কয়েক বছর টাকাও কামিয়েছিল দু হাতে। সেই প্রথম যৌবনে এবং অপরিসীম প্রাচুর্যের ভেতরে তার চোখে রঙ্ ধরিয়েছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি চাষার মেয়ে। জন্ম হল স্মাইদ্ ক্যারুর। মায়ের রঙ আর বাপের রক্ত নিয়ে। কিন্তু রক্তের প্রতি আকর্ষণের চাইতে রঙের প্রতি বিকর্ষণটাই পার্সিভ্যালের ছিল বেশি। তাই ব্যবসা তুলে দিয়ে এদেশ থেকে যখন চাঁটিবাটি তুলল, তখন স্মাইদ্‌কে ফেলে গেল রেশমহীন এই রেশমের কুঠিতে। মা-টা আগেই মরেছিল তাই রক্ষা।

স্মাইদের বয়েস তখন আঠারো বছর। কেঁদে বলেছিল, বাবা, আমার কী হবে?

অসীম বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করেছিল পার্সিভ্যাল।

—কী আবার হবে? বড় হয়েছ, নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী করে

নাও। ইংল্যাণ্ডে তোমার মতো ধাড়ি ছেলেকে বসিয়ে খাওয়ানো হয়না—বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

—কিন্তু—

—কিন্তু কী আবার?—বিরক্তির ভ্রূকুটিটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল পার্সিভ্যালের মুখে: তোমাকে তো আমি দস্তুরমতো প্রপার্টি দিয়ে গেলাম। এই বাড়ি রইল, জমি-জমাও কিছু করে রেখেছি। নাউ ট্রাই ইয়োর লাক!

—আমাকে কি কখনো তোমার কাছে নিয়ে যাবেনা? আমাদের নেটিভ হোম—ইংল্যাণ্ড?

নেটিভ হোম—ইংল্যাণ্ড! একটা তির্যক হাসির রেখা প্রকটিত হয়েছিল পার্সিভ্যালের ঠোঁটের কোণায়: আচ্ছা হবে, হবে। কিছুদিন পরে তোমায় আমি প্যাসেজ পাঠাবো, স্ট্রেট্ চলে যেয়ো। নাউ গুড্‌বাই মাই বয়—চিয়ার আপ্।

সান্ত্বনার মতো শেষবার ছেলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে পার্সিভ্যাল্ পাল্‌কীতে গিয়ে উঠল। যতক্ষণ না পথের বাঁকে পাল্‌কীটা অদৃশ্য হল, ততক্ষণ দেখা গেল সে রুমাল নেড়ে নেড়ে ছেলেকে বিদায়-বাণী জানাচ্ছে।

—জীর্ণ চেয়ারটার ওপর নড়ে-চড়ে বসল ক্রু সাহেব। ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে একটা শব্দ উঠল। তারপরে আজ একটু একটু করে কুড়িটা বছর পার হয়ে গেছে। পাল্‌কী চলে যাওয়া ওই ধূলোভরা পথটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেটেছে দিনের পর দিন, পেরিয়ে গেছে রাতের পর রাত। যে বটগাছটার তলায় পার্সিভ্যালের আরবী ঘোড়াদুটো বাঁধা থাকত, সেটা উপড়ে পড়ে গেছে ঝড়ে; যে টিনের চালার তলায় চাষারা পলুর দাম নেবার জন্যে এসে দরবার করত, সেখানে এখন অজগর জঙ্গল।

সে প্যাসেজ আজো আসেনি। শুধু বহুদূর লণ্ডনের কোন্ এক গোল্ডার্স গ্রীণে কী এক ক্যারু কোম্পানির মায়াস্বপ্ন দেখতে দেখতে আজো প্রতীক্ষা করে স্মাইদ্ ক্যারু। আশা নেই, অভ্যাস রয়ে গেছে। আজো কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে মনে হয় পিয়ন এসে দরজার কড়া নাড়ছে: চিঠি হ্যায়—চিঠি।

কিসের?

ইংল্যাণ্ডের ডাক-টিকিটমারা লম্বা একখানা খাম। খুলতেই এক-টুকরো চিঠি: মাই সান, পত্রপাঠ চলে এসো। ডাকে দুশো পাউণ্ড পাঠালাম। আমার সমস্ত সম্পত্তির তুমিই উত্তরাধিকারী, এখানে এসে ক্যারু কোম্পানির সব ভার আজ থেকে তোমাকেই নিতে হবে।

সে চিঠি এখনো আসেনি। কিন্তু কাল তো আসতে পারে? কিংবা পরশু? কিংবা তারও পরের দিন? কে জানে, কিছুই বলা যায়না। পার্সিভ্যাল্ ক্যারুর বুকের ভেতর বিবেক কখনো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেনা এও কি সম্ভব?

না, কিছুই বলা যায়না। মরা একটা মেটে সাপের মতো লাল মাটির ওই বিসর্পিল রাস্তাটা নিরুত্তর হয়ে আছে কুড়ি বছর ধরে। উত্তরের ওই রক্তাভ তারাটি কুড়ি বছর ধরে সকৌতুকে যেন একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যায়। অন্ধকার ছায়া জমে জমে ওঠা কুঠি-বাড়ির কোনো রিক্ত কক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ আকুতির স্বর মাঝে মাঝে ভেসে আসে—ভাঙা জানালায় বাতাসের ব্যঙ্গ।

লাল মাটির তপ্ত বাতাসে তপ্ত কামনার কয়েকটা দিন। কালো মায়ের কালো ছেলে, সাদা বাপ পথের ধূলোয় সে-দিনগুলোকে ঝেড়ে দিয়ে চলে গেছে। গোল্ডার্স গ্রীণ? আকাশের ছায়াপথের সঙ্গে তার তো পার্থক্য নেই কোথাও।

—চিঠি আছে সাহেব।

ক্রু সাহেব চমকে উঠল। হিজলবনী পোস্ট অফিসের পিয়ন রতন ভুঁইমালী। একখানা খাম দিয়ে সেলাম জানিয়ে চলে গেল। সাহেবের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আজো তা হলে রয়েছে লোকগুলোর!

একখানা খাম। পুরোণো অভ্যাসেই ডাক-টিকিটের দিকে প্রথমে তাকালো ক্রু সাহেব। না, না, ইংল্যাণ্ড নয়। ইণ্ডিয়া পোস্টেজ্। কলকাতার মোহর-মারা।

কিন্তু খামখানা খুলেই চক্ষুঃস্থির।

'ডিয়ার ক্যারু',

গত বছর ক্রিস্‌মাসের সময় তোমার সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছিল, আশা করি, এর মধ্যেই তুমি তা ভুলে যাওনি। তোমার সাহচর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তা ছাড়া তোমার নেমন্তন্নও আমি ভুলিনি—শিকারের অতবড় প্রলোভন ছেড়ে দেওয়া শক্ত। বহুদিন থেকেই আসবার কথা ভাবছি, কিন্তু কাজের চাপে সময় পাইনি। এইবারে অফিস থেকে দু সপ্তাহের ছুটি মিলেছে। শুনে সুখী হবে ১৫ তারিখ বিকেলে এখান থেকে রওনা হয়ে ১৬ তারিখ ভোরের ট্রেনে তোমাদের স্টেশনে পৌঁছুব। আশা করি তোমার 'কার'খানা স্টেশনে পাঠিয়ে দেবে। আর তুমি যদি নিজে উপস্থিত থাকতে পারো, তা হলে তো আরো ভালো হয়। ভালোবাসা নিয়ো ও মিসেস্ ক্যারুকে জানিও। ইতি—

অ্যালবার্ট'

শুনে সুখী হবে! ক্রু সাহেব পুরো পাঁচমিনিট বজ্রাহত হয়ে রইল। তারও পরে মনে পড়ল আগামী কাল ১৬ই তারিখ এবং কাল সকালেই বোয়ালমারী স্টেশনে বন্দুক কাঁধে অ্যালবার্টের আবির্ভাব ঘটবে। অসাড় শরীরটা আরো অসাড় হয়ে গেল। ছোটা হাজরীর যে আধখানা